দশকে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং এই যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, রাজ্যে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে, আর্থিক পরিকাঠামো এবং সরকারী পরিষেবার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ কম হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমেনি এবং এর প্রধান কারণ কৃষিতে অসম অগ্রগতি, যেখানে দেশের মোট শ্রমশক্তির সত্তর ভাগ নিযুক্ত হয়।

শিল্পের স্থানিক উন্নয়নের ধারা ও আর্থিক পরিকাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কে ধল যায় যে, এটি আন্তঃরাজ্য বৈষম্যতার আংশিক চিত্রটি তুলে ধরে। এতে যুক্তি দেখান হয় যে, অল্প কয়েকটি শহরে পরিকাঠামোগত এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এবং যার ফলে এই সমস্ত কেন্দ্রে শিল্পের একত্রীকরণ ঘটেছে। এর ফলে রাজ্যের সীমানার সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রাম-শহরে বিভাজন ঘটেছে। সুতরাং শিল্পের বিকীর্ণকরণ এবং অনুন্নত এলাকায় পরিকাঠামো রচনার এবং প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতি আংশিক সাফল্য লাভ করেছে।

অনুশীলনী ৩

১) আপনি কি মনে করেন যে, স্বাধীনতার পর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ফলে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে ? যদি ত্র মনে করেন, তাহলে পাঁচটি বাক্যে ঐরূপ উন্নয়নের সূচকগুলিকে বর্ণনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) যদি কোন রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন রাজ্যের মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (এস. ডি. পি.) দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন রাজ্যে এই সূচকের অগ্রগতির হারটি কীভাবে ও কেন একটি চেহারা নিয়েছে তিনটি বাক্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২১.৭ আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষার উপাদান

আমাদের দেশে অঞ্চলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্যতম উপাদান হ'ল সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, দরিদ্রতর রাজ্যগুলিতে পাঁচের এবং ছয়ের দশকে মাথাপিছু বিনিয়োগের হার বেশী ছিল। এটা ঘটে, কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যে লোহার আকরিক, চুনাপাথর প্রভৃতি কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পওয়া যেত এবং শিল্পের অগ্রগতির জন্য ঐগুলি ব্যবহার করা হয়। ছয়ের দশকে রাজ্যে মোট

কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিহার এক-তৃতীয়াং, মধ্যপ্রদেশ দুই-তৃতীয়াংশ এবং ওড়িশা নব্বই শতাংশ ব্যয় করে শুধু ইস্পাত কারখানা স্থাপনে। যাই হোক, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, দরিদ্রতর রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক বিনিয়োগ আশানুরূপ ফল দেয়নি। ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকে সাতের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও অনুন্নত রাজ্যগুলির স্বার্থে সুনির্দিষ্ট একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ঐ সময়ে বরং মাঝারি আয়বিশিষ্ট রাজ্যগুলি পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে বেশি অংশ পেতে সক্ষম হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে রাজ্যগুলিকে সম্পদ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যই ছিল বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা। ১৯৫১-৮১ কালপর্বে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের ন্যায় অনুন্নত রাজ্যগুলি মাথাপিছু হিসেবে বেশি অর্থ লাভ করে। তবে অল্প কিছু উন্নত রাজ্যেও যেমন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পরিকল্পনা বরাদ্দ মাথাপিছু হারে বেশী পায়।

নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুনের মাধ্যমে বেসরকারী শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করে, শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুরীর ধরণ দেখলে সেগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় না। হাজারী কমিটি লাইসেন্স প্রদানের নীতি, যা শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৫১ নামে খ্যাত, পর্যালোচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, এটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বিকাশের সহায়ক হয়নি। এটি লক্ষণীয় যে, মোট আবেদন এবং লাইসেন্স প্রদানের মধ্যে একটা যথার্থ সমানুপাতিক সম্পর্ক ছিল, যা প্রমাণ করে যে ইতিমধ্যে শিল্পে অগ্রণী রাজ্যগুলি নতুন শিল্প লাইসেন্স বেশী করে পেতে সক্ষম হয়। এটি ঘটে, করণ, এই সমস্ত রাজ্য নিজ নিজ শিল্পোন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে দরবার করতে সক্ষম হয়, এবং প্রায়ই তারা নিজ নিজ এলাকা থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন মঞ্জুর করিয়ে নিতে সফল হয়।

১৯৫৩-৮৫ কালপর্বে লাইসেন্স প্রদানের স্থানিক ধরনটি বিশ্লেষণ করলে লাইসেন্স নীতির কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা কয়েকটি শিল্পোন্নত রাজ্যে নিম্নমুখী হতে দেখা যায়। এর ফলে অবশ্য শিল্পে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলির লাভ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির ভূমিকা নিম্নমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি আয়বিশিষ্ট, রাজ্যগুলি, যেমন — গুজরাট, কর্নাটক প্রভৃতি রাজ্য শিল্প-মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নেয়; যেমন কেরালা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের লাইসেন্স প্রাপ্তির সংখ্যা সমানুপাতিক হার ঐ সময়ে কমলেও মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যগুলির নিম্নমুখী অবস্থা পাঁচের দশকের হারে অপরিবর্তিত থাকে। যদিও মোট প্রদত্ত লাইসেন্সের এক তৃতীয়াংশের বেশী লাভ করে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু। এই তিন রাজ্যে আটের দশকের মাঝামঝি পর্যন্ত, এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় গড় অনুপতে কম ছিল।

কৃষির বিকাশে এবং শিল্প লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যহীনতাই বৈষম্যমূলক প্রাতিষ্ঠনিক ঋণ বন্টনের জন্য অংশত দায়ী। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের অর্থ বরাদ্দকারী উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্থা যমন — ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা নিগম, রাজ্য অর্থনিগম প্রভৃতি মাথাপিছু আয় মাত্র ২০ টাকা হারে র্থ বরাদ্দ করে যেখানে জাতীয় গড় ছিল ১১৬ টাকা। দরিদ্রতর রাজ্যগুলি যেমন — বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ইমাচল প্রদেশ এবং রাজস্থান অতি অল্প পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ লাভ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে শিল্পোন্নত াজ্যগুলি বেশি পরিমাণ অর্থ আগাম হিসেবে লাভ করে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থকে দেশের বৃহত্তম ঋণদানকারী সংস্থা আই. ডি. বি. আই. ঋণ প্রদানের নীতির পরিবর্তন করে। এই প্রতিষ্ঠান মোট ণের একটি মোট অংশ ঘোষিত অনুন্নত জেলাগুলির জন্য বরাদ্দ করে।

২১.৮ পরিকল্পিত বিকাশ, আঞ্চলিক বিশেষীকরণ এবং ক্ষেত্রগত নির্ভরশীলতা

এক নিশ্চল কৃষিক্ষেত্র এবং একটি দুর্বল ও বিকৃত শিল্পভূমি ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। স্বাধীন ভারত ঐ সহায় সম্বল নিয়ে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর এবং অর্থনীতির আঞ্চলিক কাঠামোর ঔপনিবেশিক বিকৃতি সংশোধন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সরকার ব্যাপকভাবে মূল ও ভারী শিল্পে বিনিয়োগ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। নির্বাচিত কিছু এলাকায় প্রাপ্ত সম্পদের কেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং এইসঙ্গে অর্থ বন্টন করা হয় প্রত্যেক রাজ্যে কৃষির স্থিতিশীলতার জন্য, শিল্পক্ষেত্রের এবং পরিষেবার বিকাশ বৃদ্ধির জন্য। এর ফলে আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের দু'টি মানচিত্রের উদ্ভব ঘটে। প্রথমত, 'একত্রীকৃত ধরন', — যা মূলধন-নির্ভর এবং গড়ে ওঠে অল্প বড় শহরে এবং তার আশেপাশে। দ্বিতীয়ত, 'বিকীর্ণকরণ ধরন' — যা কম মূলধন-নির্ভর এবং ছোট ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত।

শিল্পায়নের এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই দুই সুস্পষ্ট ধারার নির্দেশ-নির্ভর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আট কোটি 'একত্রীকরণ' উন্নয়ন ভারতীয় শিল্প মানচিত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। এগুলির মধ্যে পাঁচটি কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এবং জামশেদপুর শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং এদের চারপাশে নিম্ন পর্যায়ের বিকীর্ণ শিল্প গড়ে ওঠে। প্রথম তিনটি কেন্দ্র ঔপনিবেশিক ভারতের বন্দর শহরে গড়ে ওঠে এবং এটাই প্রমাণ করে যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থানিক কাঠামোটি এখনও শিল্পের মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর এবং জামশেদপুর-ধানবাদ অঞ্চলের অগ্রগতির সূচনাও ঔপনিবেশিক যুগে শুরু হয়, তবে স্বাধীনতার পর এদের উচ্চহারে অগ্রগতি হয় মূলত সরকারী আনুকূল্যের জন্য। বন্দর শহরের মত এখানেও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র প্রভাব দুর্বল। এই প্রক্রিয়া প্রায়ই কৃষি উৎপাদনরে নঞর্থক প্রভাব ফেলে এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ, ছোট ছোট শহরে এবং চারপাশের গ্রামীণ এলাকাতে প্রচলিত শিল্পের এবং হস্তশিল্পের গৌরব অস্তমিত হয়। অপর তিন 'একত্রীকৃত শিল্প'-কেন্দ্র দিল্লী, আমেদাবাদ এবং লুধিয়ানা-জলন্ধর শহরকে কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তবে এগুলির সঙ্গে সঙ্গে 'বিকীর্ণ শিল্পে'র ও বিকাশ ঘটে। শিল্প বিকাশের বিকীর্ণ ধারা প্রসারিত হয় দক্ষিণে কেরালায়, অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে, এবং কর্নাটকে, উত্তরে দিল্লী, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে এবং মধ্যাঞ্চলে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ও মধ্যপ্রদেশে। গ্রামীণ ও ছোট ছোট শহর নির্ভর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কেরালা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এই ধারা দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য এলাকাতেও দেখা যায়। ব্যাঙ্গালোর ছাড়া ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাতে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র অনুপস্থিতি তাদের অগ্রগতি হার কমিয়ে দেয়। গুজরাট, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা কিছু সাফল্য লাভ করে বিকীর্ণ শিল্পায়নের সঙ্গে একত্রীকৃত শিল্পায়নের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে। এই অঞ্চলের কৃষির বিকাশ শিল্পায়নকে সহায়তা দান করে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এটা বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যৎ বিকাশের ভিত্তি হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোকে গ্রহণ করার ফলে কৃষির বিকাশ ব্যাপকভাবে অসম হয়ে পড়ে। এর ফলে এলাকাভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্র সীমিতভাবে গড়ে ওঠে স্থানীয় উপাদানের সাহয্যে এবং তৈরী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে কম উন্নত এলাকার মধ্যে শক্তিশালী সংযুক্তিগড়ে ওঠেনি। যখন অনুন্নত রাজ্যে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, যার সঙ্গে প্রযুক্তির শক্তিশালী সংযুক্তি আছে ইস্পত শিল্পের, গড়ে উঠল অল্প কয়েকটি বৃহৎ শহরকে কেন্দ্র করে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার নিত্যনতুন এবং লাভজনক অংশ অনুন্নত এলাকা থেকে শহরের শিল্প কেন্দ্রে 'পাচার' করার মাধ্যমে উৎপাদনক্ষেত্রগুলি খণ্ডিত হয়। এই চিত্র দেখা যায় ভিলাই, বোকারো, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে, যেখানে নতুন শিল্প-কেন্দ্র গড়ে ওঠে ব্যাপক সরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই সমস্ত শহরের অধিকাংশক্ষেত্রে একজন কুড়ি/তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে অতি উন্নত লৌহ ধাতুশিল্প বা বৃহৎ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্পকেন্দ্র থেকে নব্যপ্রস্তুরযুগীয়

পশ্চাৎ প্রদেশের দেখা পাবেন।

বিকীর্ণ শিল্পায়নের সুফল অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ লাভ করে। তবে এই প্রক্রিয়ার দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এটি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না বা বেশীদিন স্থায়ী হয় না, যদি না এটি সঙ্গে 'একত্রীকৃত শিল্পায়নে'র সংযুক্ত ঘটে এবং সেটির মাধ্যমে জাতীয় বাজারের। অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জাতীয় কমিশন (শিবরামন কমিটি) তর প্রতিবেদনে সুপারিশ করে একশটি 'একত্রীকৃত শিল্পায়ন' কেন্দ্র স্থাপনের, যার সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। অতীতে দেখা গেছে যে, বিকীর্ণ না হয়ে একত্রীকরণ কতকগুলি বদ্ধ ঘাঁটির জন্ম দিয়েছে, আবার একত্রীকরণ ছাড়া বিকীর্ণায়ন প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা এবং অদক্ষতার জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে শিল্পায়নের এবং কৃষি বিকাশের দু'টি ধারার ঐক্য সাধন প্রয়োজন। কোন অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই এমনভাবে গড়ে উঠবে যার ভিত্তি হবে স্থানীয় সম্পদ এবং জাতীয় বাজারের সঙ্গে স্থানীয় বাজারের সংযোগ স্থাপন। এটি সম্ভব হবে যদি জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা রচিত হয় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে। ভবিষ্যতের ভারতে অগ্রগতির আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্য রূপায়নের জন্য পরিকল্পনার এবং সরকারের হস্তক্ষেপের ভূমিকার ও গুরুত্বের প্রতি এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভারসাম্য আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিপ্রস্তর।

অনুশীলনী ৪

কেমন করে আঞ্চলিক বিকাশের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে এবং সেজন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, এই বিষয়ে পাঁচটি বাক্যে আপনার মতামত লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২১.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশের মত দেশ। এখানে একদিকে যেমন আবহওয়া, জমি, খনিজদ্রব্য, বন, জনসম্পদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি ভাষা, জনবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক শক্তি এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় উপাদানের সর্বোত্তম ব্যবহারের দ্বারা আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্ষম অথবা কেবলমাত্র ঐগুলির ব্যবহারের দ্বারা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিতে পারে। ঔপনিবেশিক ভারতে অর্থনৈতিক শক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে বিকৃত উন্নয়ন ঘটায়। অনুন্নয়নের সমুদ্রে শিল্পের একত্রীকরণ ঘটে বন্দর শহরগুলিতে এবং কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ শহর রেলের সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, যেটুকু শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটে তা কেবল কয়েকটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতাউত্তরকালে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপক আকারে শুরু হয়, কিন্তু

ঔপনিবেশিক যুগের বিকৃতি পুরোপুরিভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, নতুন প্রযুক্তি, যেমন কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব, অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্যকে প্রকট করে তোলে। যখন রাজ্যে রাজ্যে ভারতের শিল্পের বিকাশ আগের তুলনায় কম অসম, তখন আবার এমন নজিরও আছে যাতে দেখা যায় যে, আন্তঃরাজ্য ও গ্রাম-শহরের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান বেড়েছে। ভারসাম্য ঘেঁষা আঞ্চলিক বিকাশ এবং বিশেষীকরণ অত্যন্ত সতর্কভাবে আঞ্চলিক সম্পদ নির্ভর বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে সম্পাদিত করতে হবে।

২১.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

যৌগিক গড় : পরির্তনীয়ের মানসমষ্টিকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত গড় মান।

পরিবর্তনের স্থানাঙ্ক : এটি তথ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটি আপেক্ষিক মাপ, যেটি গাণিতিক গড়ের 'স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশনের' শতকরা হিসেবকে বোঝায়।

পারস্পরিক সম্পর্ক : যখন দু'টি পরিবর্তনীয় একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন বলা হয় যে তারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যেমন- কোন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সাধারণত ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ অর্থাৎ এই দুই পরিবর্তনীয় একই দিকে অগ্রসর হয়। যখন দু'টি পরিবর্তনীয় পরস্পরের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় তখন তাদের সম্পর্ক হয় নেতিবাচক।

স্থায়ী পুঁজি : এটি উৎপাদনের স্থায়ী উপকরণকে বোঝায়, অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে যেগুলি একবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। যেমন-হাতিয়ার, যন্ত্র, কারখানার শেড ইত্যাদি।

জাতীয় মোট উৎপাদন এবং স্থির মূল্য : উৎপাদন প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয় তার মূল্য বাদ দিয়ে একটি দেশ যত উৎপাদন করে তার মোট মূল্যকে জাতীয় মোট উৎপাদন বলা হয়।

নিট বপন এলাকা : যে-কোন সময়ে চাষের মোট এলাকাকে নিট বপন এলাকা বলে। যদি এটি বছরকে বোঝায়, তাহলে একবছরে কতবার চাষ হচ্ছে সেটা ধরা হয় না। কোন এলাকা একাধিকবার চাষ করা হলেও একবার ধরা হয়।

পরিকল্পনা-বহির্ভূত সম্পদ : সাধারণত উপাদানকে-ভৌত ও আর্থিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আর্থিক উপাদানকে, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সরকারী ব্যয়ের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ক্ষেত্রের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাকে পরিকল্পনা-বহির্ভূত উপাদান বলে। যেগুলি বর্তমান পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত হয় না সেগুলিকে পরিকল্পনা-বর্হিভূত বিষয় বলা হয়। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য হ'ল, প্রতিরক্ষায়, আইন ও শৃঙ্খলা, প্রশাসন ইত্যাদি। প্রশাসনিক সুবিধার্থে পরিকল্পনায় কমিশন পরিকল্পনার জন্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করে এবং অর্থ কমিশন পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয়ের জন্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ঔপনিবেশিক ভারতে এমন ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রবর্তন করে যেখানে ভূমির উপর চিরস্থায়ী খাজনা আদায়ের চিরস্থায়ী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয় ব্রিটিশ সরকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বাৎসরিক কর প্রদানের বিনিময়ে।

ভৌত উপাদান : কোন দেশের বা অঞ্চলের ভৌত এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন-আবহাওয়া অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জমির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

উৎপাদনশীলতা : উপকরণের অনুপাতে কোন এককের উৎপাদনের পরিমাণ, যেমন-শ্রমের উৎপাদনশীলতা বলতে বোঝায় শ্রমের একটি একক কোন উপকরণের সাহায্যে কতটুকু উৎপাদন করছে সেটা তার উৎপাদনশীলতা।

অঞ্চল : অঞ্চল বলতে দেশের অর্থনীতির কোন ভৌগোলিক এলাকাকে বোঝায় যার প্রাকৃতিক, ভৌত উপাদান, জনসংখ্যা এবং আর্থ-সমাজিক উপাদান অন্য এলাকা থেকে তাকে পৃথক করে। কোন্ উপাদানের ভিত্তিতে অঞ্চলকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সেটা নির্ভর করে কী উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক ক্রমোচ্চতা : আর্থ-সামাজিক বিকাশের ধারায় জাতীয় অর্থনীতির আঞ্চলিক এককের পরস্পর নির্ভরতার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে উপাদান, পরিকাঠামো, যেমন-যোগাযোগ, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন এলাকা অনেক বেশী এগিয়ে যায় এবং অন্য এলাকা ঐ এলাকার নীচে অবস্থান করে। আঞ্চলিক অর্থনীতির এই ধারাকে আঞ্চলিক ক্রমোচ্চতা বিশ্লেষণে ভূষিত করা হয়।

সাধারণ বিচ্যুতি : যৌগিক গড়ের কাছাকাছি পরিবর্তনীয়ের বিকীর্ণ পরিমাপ।

রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন : রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলতে বোঝায় মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনের জন্য মোট ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্য বাদ দিয়ে যে মূল্য থাকছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী মানুষের অবদানও যুক্ত হতে পারে।

রাজ্যের মাথাপিছু আয় : রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী মানুষের দাবি বাদ দেওয়া হয় এবং রাজ্যের বাইরে থেকে রাজ্যবাসীর আয় যোগ করা হয়। প্রাপ্ত ফলকে রাজ্যের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তা রাজ্যের মাথাপিছু আয়।

ক্ষেত্রগুলির বাড়তি মূল্য যোগান : এর অর্থ হ'ল জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদনের অবদান। এটি পরিমাপ করা হয় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত মোট মূল্য দিয়ে, এর মধ্যে অন্য ক্ষেত্র থেকে ক্রয়কে বোঝান হয়। এর মধ্যে শ্রম, জমি, মূলধন এবং সংগঠকের পাওনাও ধরা হয়।

২১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Bhalla, G. S. and Alagh, Y. K. : 1979, *Performance of Indian Agriculture - A Districtwise Study, Sterling*, New Delhi.

Davis, Kingsley : 1951, *The Population of India and Pakistan*, Princeton University Press, Princeton.

Mishra, G. P. : *Regional Structure of Development and Growth in India* Volume I Ashish Publishing House, New Delhi.

Mitra, A. : 1961, *Levels of Regional Development in India*, Census of India, Vol. I, Part IA (i), Government of India, New Delhi.

Sengupta, P and Sdasyuk, G. V. : 1961, *Economic Regionalisation of India-Problems and Approches*, Census of India, Vol. : I, No. 8, New Delhi.

Government of India 1976, *Report of the National Commission on Agriculture*, Part-4, Publication Division, New Delhi.

২১.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

একটি অঞ্চল সংজ্ঞায়িত হয় বিভিন্ন মানদণ্ডে-কৃষি নির্ভর দেশে বৃষ্টিপাত, ত্রাণ এবং শস্য চাষের ধরণ অত্যন্ত জরুরী। এগুলি ভৌত উপাদান। অনুরূপভাবে, জমির মালিকানার বন্টন, ব্যাঙ্ক-ঋণ, ভূমিহীনতা, উপজাতিদের উপস্থিতি ইত্যাদি আর্থসামাজিক উপাদান হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নগরায়ন এবং পেশার ধরণ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। সুতরাং একটি অঞ্চলকে এই সমস্ত উপাদানের সমাহারে যেগুলি কম বেশী সমজাতীয়, সংজ্ঞায়িত করাই শ্রেয়।

অনুশীলনী ২

২১.৩ অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পাঠ করলেই আপনার উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী ৩

২১.৪ এবং ২১.৫ অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পাঠ করুন এবং উন্নয়নের সূচক বার করার চেষ্টা করুন, যেমন-শ্রমের এবং জমির উৎপাদনীলতা, মাথাপিছু ক্ষেত্রের আয় ইত্যাদি, এবং আপনার উত্তর পাবেন। ২১.৬ অনুচ্ছেদটি যত্নসহকারে পড়ুন এবং উন্নয়নর পরিমাপের জন্য ও তার সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্যও মাথাপিছু আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিবর্তনীয়তা লক্ষ্য করুন। এবারে উত্তরগুলি লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী ৪

অনুচ্ছেদ ২১.৭ এবং ২১.৮ ভাল করে পড়ুন। অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য লাইসেন্স প্রদানের নীতির, ব্যাঙ্ক-সম্পদের বিতরণ, রাজ্যের মধ্যে ঋণদানের প্রতিষ্ঠানের শর্তের প্রভাব পরখ করুন এবং উন্নয়নে 'একত্রীকৃত' ও 'বিকীর্ণ' প্রক্রিয়া বিশ্লেষণকে বিবেচনা করে উত্তর রচনা করুন।

একক ২২ ❑ বহুধর্মীয় কাজ : ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য

২২.১ প্রস্তাবনা

২২.২ পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.২.১ উৎপত্তি

২২.২.২ ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র

২২.৩ ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

২২.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় আন্দোলন

২২.৩.৩ ভারতবর্ষ কী কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল

২২.৪ ভারতীয় সংবিধান : ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি

২২.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী

২২.৬ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাবলী

২২.৬.১ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমস্যা

২২.৬.২ রাজনীতি ও ধর্ম

২২.৬.৩ সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

২২.৬.৪ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের মনোভাব

২২.৭ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

২২.৭.১ শিক্ষা

২২.৭.২ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

২২.৮ সারংশ

২২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২২.১১ উত্তরমালা

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাগুলি অনুধাবন করা। এই এককটি অনুশীলন করে আপনি যা জানতে পারবেন তা হ'ল :

- পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
- ভারতবর্ষে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হ'ল তার বর্ণনা।
- ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি নির্দেশ করা।
- প্রতিবন্ধকতাগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা নির্দেশ।

২২.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ বরাবরই নানা ধর্মের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। খুব অল্প সমাজব্যবস্থাই ভারতবর্ষের মত এরকম বহুধর্মীয় ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের সহাবস্থান, যাদের মধ্যে দু'একটি একেবারেই একে অন্যের বিপরীত, এই দেশের ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও সহনশীলতার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই দেশের বিশেষত্ব ও খ্যাতি এই বহুত্ববাদ খ্যাতি এই বহুত্ববাদের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত।

এ কথা কখনই বলা যাবে না যে, ভারতীয় সমাজ যাবতীয় ধর্মীয় উত্তেজনা ও সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকেছে। কিন্তু তিন হাজার বছর বা তারও বেশী সময় ধরে ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ ইতিহাস, সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তিক্ত ধর্মীয় সংঘর্ষের বা যুদ্ধের বিশেষ কোন উদাহরণ নেই। এমন কি মুসলমানদের আগমনের ফলেও কোন বড় আকারের ধর্মীয় যুদ্ধ হয়নি। বরং কয়েকজন অসহিষ্ণু শাসকের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে ধর্মীয় বিভেদের বদলে ধর্মীয় ঐক্যই বজায় ছিল। (অন্যদিকে ঐ সময়ে ইউরোপ ছিল মারাত্মক ধর্মীয় সংঘর্ষের কবলে)। মুসলমান রাজত্বের পতনের পর ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ভারতীয় ঐতিহ্যটি ভালমতই বজায় ছিল। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিত ভাবেই অংশ নিয়ে ছিল।

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। ব্রিটিশরা যে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া উন্মোচন করেছিল তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রকাশ ঘটে এবং সেই প্রতিযোগিতা থেকেই ধর্মীয় বিভেদের বীজ বপন শুরু হয় এবং মাত্র অর্ধ-শতাব্দী কালের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমাজ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হিংসার ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের মত দলগুলি ভারতীয় রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিগ্রহণে বাধ্য করল; ইতিহাসের এটাই পরিহাস যে ১৯৪৭ সালে মানব ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক রক্তাক্ত পর্বের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ মুক্তি পেলে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে। দেশ বিভাগ ও দেশ বিভাগের পিছনের ঘটনাবলী হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে এমনই তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে গেল, যা দেখে মনে হ'তেই পারে যে, এই দেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যটি বুঝি চিরতরে বিলুপ্ত হ'ল।

কিন্তু দেশ বিভাগের মাত্র দু'বছর পরে, যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান তৈরী হ'ল তখন, নেহেরুর উৎসাহে এবং পরিচালনায় জাতীয় নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিল। বলা হ'ল, 'ভারতবর্ষ এমনই এক রাষ্ট্র হবে যেখানে সব ধর্মকে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমানভাবে এবং পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হবে'। সংবিধান রচনার সময়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবগত তিক্ততাকে এবং সাম্প্রতিক অতীতের সংঘর্ষগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। পাকিস্তান যে ধর্মীয় ভেদাভেদের আদর্শ নিয়েই নতুন রাষ্ট্র

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেটিকে উপেক্ষা করেই ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিল; সিদ্ধান্ত হ'ল যে, ভারতবর্ষ একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে এবং তার সব নাগরিকের জন্যই ধর্মের অধিকার, এক নাগরিকত্ব এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে।

অন্য একটি দিক থেকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে ধর্মের প্রতি অবিচল আগ্রহ, অঙ্গীকার এবং অনুরাগ। এটি অতিরঞ্জন হবে না যদি বলা হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনে ধর্মই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ এল, ভারতবর্ষে তখন কিন্তু প্রথম পছন্দটি বেছে নিল না।

এই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে বিচার করতে হয়, কোন্ উপাদান বা কারণগুলি ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রূপটি বেছে নিতে সাহায্য করেছে এবং কিভাবেই বা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাগুলি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রভাবিত করেছে।

সাম্প্রতিককালের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্বটি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন এবং উপলব্ধি করার কাজটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে এই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, ভারতীয় সমাজে যেন দ্রুত হিন্দুত্বের পুনরুভ্যুদয় এবং মুসলমান ও শিখ মৌলবাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

২২.২ পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি প্রথম চয়ন করেন জর্জ জেকব হলইয়ক্ (১৮১৭-১৯০৬) ১৮৫১ সালে। শব্দটি লাতিন 'স্যেকুলাম' থেকে নেওয়া হয়েছে। লাতিন শব্দটির অর্থ হ'ল 'বর্তমান যুগ'; অবশ্য লাতিন ভাষায় এই শব্দটিকে 'পৃথিবী' শব্দটির বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন তাই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে 'ধর্ম' বা 'পবিত্র' অবস্থানকে বোঝান হয়েছে। অবশ্য শব্দটি হলইয়ক্-এর রচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই পশ্চিমী সমাজে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়া/আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

২২.২.১ উৎপত্তি

ইউরোপ এবং ইংল্যাণ্ডে বহু প্রাচীনকাল থেকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম ছিল। তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার জোরে পোপ থেকে শুরু করে তাঁর অধস্তন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষগণ পর্যন্ত অনেকেই সাধারণ মানুষের এমন কি রাজার উপরও নিপীড়ন চালাতেন। তাই সাধারণ মানুষ এবং রাজন্যবর্গ উভয়েই সংগ্রাম চালিয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে এবং দৈনন্দিন রুটিনমাফিক জীবনকে চার্চ ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তকরতে। শোষণ-নিপীড়নের ব্যবস্থা এবং সমর্থন তৈরী করছিল বলেই ধর্ম এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে পুরোহিতদের তরফে পীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপ এতই নির্মম হয়ে পড়েছিল যে, তাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন ধর্মবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত না হওয়াটাই ছিল আশ্চর্য্যজনক। এই কারণেই পশ্চিমী সমাজে ধর্ম শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'ল, বিশেষ করে সেই সব শক্তির যেগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে (যার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের

কর্মধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল) ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিল। চার্চ এবং তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি সক্রিয় হ'ল সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিতি পেল; আর যে সব প্রক্রিয়া ও আন্দোলন ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের পতন এবং যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করল সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষকরণ নামে পরিচিত হ'ল।

মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এই পার্থিব জীবনের বিষয় নিয়েই, মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধনে এবং জনকল্যাণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকে : ফলত, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ ধর্মের ভূমিকাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন বিশ্বাসের জগতের বাইরে বা পরলোকের চিন্তার ক্ষেত্রের বাইরে, গুরুত্বহীন করে তুলেছে।

পশ্চিমী জগতের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া সেখানকার মানুষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মানুরাগের তরলীকরণে সহায়তা করেছে। এর একটি প্রধান ফলাফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি, বিশেষত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তরোত্তর যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এরই সঙ্গে লক্ষণীয় ইউরোপীয় সমাজের সংহতিসাধনকারী শক্তি হিসেবে ধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্যের বিলুপ্তি। বরং দেখা যাচ্ছে, ক্রমশই জাতীয়তাবাদের মত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ সেখানকার সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যসাধনকারী নীতি হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ব্যক্তির তরফে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিকাশের অর্থ হ'ল অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এবং সেই সমাজে কর্মে নিযুক্ত থাকার সুযোগ। ম্যাক্‌কী বলেন, 'সামাজিক পৃথিবী যেমন বহুবাদী, তেমনি বিশ্ববীক্ষণও বহুবিধ'। মানব ইতিহাসে যখন আধুনিক বিজ্ঞান ঠিকমত বিকাশ লাভ করেনি, যখন মানব জীবন সনাতন প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, তখন কিছু দুঃসাহসী এবং দায়িত্বশীল মানুষ অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাকে একপ্রকার বিপ্লব বলেই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

২২.২.২ ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র

ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববীক্ষণের স্বীকৃতি ও প্রসার ধর্মের গুরুত্ব ও ভূমিকার তরলীকরণে সাহায্য করেছে বটে, তাই বলে তা, এমন কি পশ্চিমী জগতের ক্ষেত্রেও, ধর্মের পরিপূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়েছে এমন বলা যাবে না।

তবুও ধর্মের পরিব্যাপক ভূমিকা হ্রাস পাওয়ার ফলে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের বিপরীত এবং বৈরী। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ধারণাটি সত্য নয়। বৈরীভাবমূলক হওয়ার বদলে বলা যায় এই দুইয়ের সম্পর্ক হ'ল পারস্পরিক অনন্যতার সম্পর্ক। ধর্মের প্রধান কথা হ'ল কোন ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস এবং পরলোক সংক্রান্ত বিশ্বাস। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় নয়; ধর্মনিরপেক্ষতা সানন্দে এগুলিকে ধর্মের হাতে ছেড়ে দেয়।

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা মনে রেখে লাউয়ের বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষকরণের পাশাপাশি ধর্মও বিকশিত হতে পারে মানুষের নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে এবং মানুষের অস্তিত্ব সংক্রান্ত কোনও অলৌকিক ভাবনা উপস্থাপনার ব্যাপারে ধর্মের বিশেষ বিকাশ ঘটতে পারে।' সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'ধর্ম'কে বিপরীতমুখী অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। লাউয়ের বলেছেন, বড়জোর ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সধন করে, ধর্মের বিলুপ্তিসাধন করে না'। আবার এই সিদ্ধান্ত মেনে এটা ভুললেও চলবে না যে, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের

সম্পর্ক রয়েছে। ম্যাক্‌কী যে কারণে বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষকরণ পৃথিবীর পবিত্র (দৈব) চরিত্রের ধারণাকে বর্জন করতে সাহায্য করে, যে কারণে মানুষ সমাজকে প্রাথমিক ভাবে আর ধর্মীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুধাবন করে না'। তিনি আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল অন্য জগতের ধারণা থেকে সরে আসার প্রক্রিয়া এবং এই পার্থিব জগতের দিকে নজর ফেরানোর প্রক্রিয়া'। 'ধর্ম' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে একে অপরের বিপরীত ও বৈরী হিসেবে অভিহিত না করার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার যে, উভয়ের 'অবশ্যম্ভাবী' বিরোধের এই ভুল ধারণাটি গড়ে ওঠার মূল কারণ হ'ল নানাপ্রকার কুসংস্কার, অর্থহীন আচার এবং কিছু বদ্ধমূল বিশ্বাসকে ভ্রান্তিবশত ধর্ম বা ধর্মীয় বিয়ে হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা। আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা নিঃসন্দেহে এই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চায়। কিন্তু গোপাল দেখিয়েছেন, যদি ধর্ম 'জীবনের উচ্চতর বিষয়' নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘাত হওয়ার কোন কারণ নেই।

এই আলোচনা শেষ করার আগে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সেটি হ'ল এই যে, শেষ বিচারে ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি মনোগত ভাব, যা একদিকে যেমন যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাধান্যকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি অপরদিকে মানুষে মানুষে সমতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে; একজন ব্যক্তি যে অপর একজনের মতই ভাল হতে পারে এই সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করে। এখানেই রয়েছে দুইয়ের মিলনস্থল-ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে এইভাবেই বলা যায় একই মুদ্রার দুই পিঠ।

অনুশীলনী ১

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে.....নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম থেকে।

(খ) ধর্মের বিষয় হ'ল.....জগৎ। অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র হ'ল..... .....জগৎ।

২. ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা কি একে অপরের বিরোধী ?

.....

২২.৩ ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা

এবার আমরা ভারতবর্ষে পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করব।

আগের আলোচনায় দেখেছি, পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়া এই পার্থিব জগৎ থেকে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব হ্রাস ও দূর করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুগপৎ সংঘটিত হয়েছে। এই হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'ধর্মহীনতা' প্রায় অভিন্ন বোধ হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কেবল রাষ্ট্রের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। তাই আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথাই কেবল শোনা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কথা কখনও বলা হয় না। এরকম হওয়ার কারণ অংশত এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত যে ভাবনাগুলি ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে সেগুলি পশ্চিমের ধ্যানধারণা থেকে বহুলাংশেই ভিন্ন। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলত সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী শক্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এটাই বোঝান হয় যে, এখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলবে না, বরং প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে একইরকম সখ্যতা বা সমদূরত্ব বজায় রাখবে। নিরপেক্ষতার এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র যাবতীয় আন্তঃ গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্বসংঘাতকে প্রতিহত করবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং একই সঙ্গে আমাদের সমাজের দ্বন্দ্বমুখর বহু বিচিত্র প্রতিযোগী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে একটি অভিন্ন জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত করবে। এটাই ভাব হয়েছে যে, এই জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে সহায়তা করবে, যে চেতনা ধর্মকে অস্বীকার না করেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয়বোধের উর্দ্ধেই বিরাজ করবে। এর তাৎপর্য হ'ল এই যে, নাগরিকগণ, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত সকলেই, জনজীবনের একদিকে তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ও অপরদিকে তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস ও আচার-আচরণের পার্থক্য বজায় রাখবেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় ভিন্নতার কারণ হ'ল উভয়ের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য।

২২.৩.১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় ঐতিহ্য

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে। ভারতবর্ষে ইউরোপের অনুরূপ কোনও সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের দৃষ্টান্ত নেই। হিন্দু বা ইসলাম কোনও ধর্মেই ব্রাহ্মণ বা উলেমান সংগঠিত চার্চের সংগঠিত যাজকদের মত জনসাধারণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়নি। তাই প্রাক্-মুসলিম কিংবা মুসলমান আমলে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যর বা জনসাধারণের সংঘর্ষের কোনও ইতিহাস নেই। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালের কথা বাদ দিলে, ভারতবর্ষের সমাজে আন্তঃগোষ্ঠীস্তরেও সাধারণভাবে ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যটাই বজায় ছিল।

মুসলমান আমলেও ইসলামকে সরকারীভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। দু' একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে মুসলমান শাসকগণ সাধারণভাবে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কালক্রমে হিন্দুরা মুসলমান রাজাদের প্রশাসনিক কাঠামোতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্জন করেছে এবং তাই মসুলমানদেরও সাধারণ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 'নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও।' পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশরা ভারত দখল করল, তখন তার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনধারার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী নির্বিকারে থেকে ছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ রাজ 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণা ও আচরণ চালু করল যাতে জাতি, ধর্মগত বিশ্বাস নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এই ব্যাপারটা প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আগেকার ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যের ইতিহাসের সঙ্গে ব্রিটিশরাজ যুক্ত করল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (যথা, ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সংশ্রব না রাখা এবং আইনের দৃষ্টিতে সাম্য)। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এভাবেই সূত্রপাত।

২২.৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় আন্দোলন

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা গেল যে, ব্রিটিশরা তাদের পুরোন নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের সেই বহু পরিচিত 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' করার নীতি গ্রহণ করেছে, যার পরিণতিস্বরূপ ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন মারাত্মকভাবে সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিগ্রহ করে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয় নেতারা বুঝেছিলেন য়ে ধর্মীয় অনৈক্য কেবল যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যহত করবে তা নয়, যখন প্রকৃতই স্বাধীনতা আসবে তখন ঐ বিভেদ দেশের পক্ষে এক প্রবল সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

এই অস্বাস্থ্যকর বিভাজন দূর করার প্রয়াসে নেহেরু ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে একটি প্রাক্-সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিলেন। সেই অধিবেশন গৃহীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে তিনি এই ধারাগুলি সংযোজিত করলেন যে, ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক বিবেকের অধিকার এবং যে কোন ধর্ম গ্রহণের ও অনুসরণের অধিকার লাভ করবে; সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে গণ্য হবে। জাত, ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও ব্যবসা বাণিজ্য বা পেশার ক্ষেত্রে কিংবা কোন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন নাগরিককে ভেদাভেদের ভিত্তিতে অযোগ্য বলা যাবে না এবং রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। গোপালের মতে এটা হ'ল 'ভারতীয় পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার প্রথম বাস্তব রূপদান, যা কিনা পরবর্তীকালে বহু বছর পরে ভারতীয় সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারাটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।'

এই প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতির জগতে পাকিস্তানের দাবি ওঠেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেহেরু যে প্রাক্-সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নিয়ন্ত্রণে কোন সাহায্য করল না এবং দেশ শেষ পর্যন্ত বিভাজনের পথেই গেল।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সংবিধান রচনার কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এই কাজে নানা বিরোধী প্রবণতা ও স্বার্থ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। একদিকে সমস্যা ছিল পাকিস্তানের, যার আবির্ভাব হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ এবং ধর্মোন্মাদনাকে ব্যবহার করে, যা কিনা শেষ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলির অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

অন্যদিকে ছিল গান্ধী, নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের চিন্তা, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক বিকাশ ধর্মীয় বিভেদকে অতিক্রম করে যাবে। এই নেতৃবৃন্দ কখনই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তোলার জিন্নার তত্ত্বকে মেনে নেননি। কিন্তু জাতীয় নেতারা যে আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, সেগুলি সব পিছনে পড়ে রইল দেশ বিভাজনের দাঙ্গার মুখে, যেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি উস্কানী যোগাল উন্মত্ত জনতাকে। পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত যদি একটি নতুন আদর্শ হয়-তবে ভারতবর্ষও একটি ধর্ম ভিত্তিক হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারত; কেননা এখানেও সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগই হিন্দু। কিন্তু সেই কঠিন সময়ের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে নেহেরু ও তাঁর সহকর্মীগণ তাদের ১৯৩১ সালের অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখে ভারতবর্ষকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবেই ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর হইলেন, অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছে কেবলমাত্র ১৯৭৬ সালে।

২২.৩.৩ ভারতবর্ষ কী কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল

ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটি দেশভাগের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে অদ্ভুত মনে হলেও এটি ছিল নানাধরনের প্রভাবেরই পরিণতি।

প্রথমত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতেই ধর্মের প্রভাবমুক্ত এই জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান বৈরীতার অন্ধকারতম পর্বেও এই ব্যাপারে কোনও আপোষ হয়নি, পাকিস্তান নিয়ে দাবি জোরদার হওয়ার পরেও নয়। বরং দেশবিভাগ যতই সুনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ততই গান্ধী, নেহেরুর মত নেতৃবৃন্দ আরও দৃঢ়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত জাতীয়তাবাদক আঁকড়ে ধরেছিলেন। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্র গঠনের ঐ পথ থেকে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটলে তা জতীয়তাবাদী নেতাদের দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শের বিরোধী ঘটনা হ'ত। ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে তা জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিত।

দ্বিতীয়ত, আদর্শগত বিবেচনা ছাড়াও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিকও ছিল। ভারতবর্ষ বরাবরই বহুবিচিত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর দেশ; স্বাধীনতার পরও তার এই বহুবাদী চরিত্র অব্যাহত ছিল। আসলে মুসলমানদের একটি বড় অংশ পাকিস্তান যেতে চাইল না; তাঁরা এই দেশের অন্যান্যদের সঙ্গেই নিজেদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গেঁথে রাখলেন। মুসলমান ও অন্যান্যদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মেছিল এই দেশের আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে; সবাই বুঝেছিলেন যে শান্তিতে ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা এই দেষা বসবাস করতে পারবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এই বহুত্বের জন্যও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

এই সব কিছুর উপরে হ'ল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা। ওই মর্মান্তিক ঘটনা হিন্দু-অহিন্দু সকলকেই বিচলিত করেছিল এবং আপামর ভারতীয়দের মনে এই ধারণা তখন আরও জোরালো হয়েছিল যে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হবে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সর্বোত্তম নিরাপত্তাবিধান। এই সত্যটি তখন উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, রাজনীতি ও ধর্মের পৃথকীকরণ না হ'লে সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের স্বার্থে অন্তর্ঘাতী বিবাদগুলি বন্ধ করা একান্তই জরুরী ছিল।

সুতরাং এটা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তার রাজনৈতিক অবস্থান, উভয়ই ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে পরিচালিতত করতে সহায়তা করেছে। তাই ১৯৫০ সাল যে সংবিধানটি গৃহীত হ'ল সেকানে দেখা গেল বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারার মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি স্পষ্ট ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র দেওয়া হয়েছে। স্মিথ্-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়:

'ভারতীয় সংবিধান হ'ল এক মৌলিক বিধি যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি তাদের বর্তমানরূপে বজায় থাকছে ততক্ষণ এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্জনের কথা ভাবা যায় না।

২২.৪ ভরতীয় সংবিধান : ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি

কোন্ অবস্থায় ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটা সংক্ষেপে বিবেচনা করার পর এখন আমরা সাংবিধানিক ধারাগুলি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারি, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন জানানো হয়েছে এবং যেগুলির মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি ও চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

সংবিধানের ১৫.১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। ১৬ নং ধারায় রাষ্ট্রের অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, এই ধারা অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে চাকরীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ বা অযোগ্যতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৫ নং ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেকের স্বাধীনতা এবং যে কোন ধর্ম আচরণ ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানাপ্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা বা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা যাবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সব শ্রেণীর হিন্দুর জন্যই খুলে দিতে পারে।

সকল ধর্মীয় সংস্থারই অধিকার থাকবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংগঠিত করা এবং সেগুলি রক্ষা করা; এছাড়া ধর্মীয় উদ্দেতোরা সম্পত্তি অর্জন ও রাক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করার জন্য বা তার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকেই কর দানে বাধ্য করতে পারবেন না।

কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে কোন ব্যক্তির ভর্ত্তির আবেদন নাকচ করা যাবে না। ওই সব প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তিকে ধর্মীয় শিক্ষাদানে বা প্রার্থনায় অংশ নিতে বাধ্য করা যাবে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার থাকবে তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে ওই সব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদানের প্রশ্নে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এছাড়া সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের চিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে।

এটা বলা দরকার যে, ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কিংবা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, কোনটাই চূড়ান্ত নয়, বরং সীমিত। ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানে সীমিত কারণ 'শান্তি বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যের ও নৈতিকতার প্রয়োজন'। ভারতবর্ষের সমাজের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ভোগ করবে —'দেবদাসী'র মত ধর্মীয় প্রথা, মানুষ উৎসর্গ করা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যেখানে রয়েছে।

২৫ এর ২(ক) নং ধারাতেও এরকম বিধিনিষেধের ব্যবস্থা আছে যেখানে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত যে কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করার। ২৫ এর ২(খ) নং ধারায় সামাজিক কল্যাণসাধন এবং সমাজসংস্কারের কথা বলা হয়েছে। অভিন্ন পুরবিধি গড়ে তোলার প্রসঙ্গে সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে।

হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে, হিন্দুধর্মে এমন কোন পুরোহিততান্ত্রিক সংগঠন নেই যাতে কিনা ভিতর থেকেই এর সংস্কারসাধন সম্ভব হতে পারে। আর তাছাড়া, বাইরের এই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে একটি অভিন্ন পুরবিধি গড়ে তোলার জন্য।

অনুশীলনী ২

১) ভারতীয় ঐতিহ্য ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সহায়ক কেন ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক) ধর্মীয় বিভেদকামীতা প্রতিরোধের জন্য করাচীতে ১৯৩১ সালের অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবে ..... অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খ) ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ..... অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে সব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে দু'টি যুক্তির উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২২.৫ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী।

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বপন এবং লালনের ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহেরু যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তার উল্লেখ না করলে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কাহনীটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরু ধারণা অবশ্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবিকই মৃত্যুর অল্পকাল আগে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের সংবিধান আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেছে, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, আমাদের জনজীবনের এবং জনগণের চিন্তায় তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি।'

দেখা যাচ্ছে, নেহেরু অনেক গভীরভাবে আগ্রহ ছিলেন আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সার্বিক বিকাশ ঘটানোর জন্য। এই দিক থেকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ছিল পশ্চিমে মডেলের কাছাকাছি। তাই ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা তাঁর মতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র।

জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত নেহেরু ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর যে চমকপ্রদ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল যার জন্য তিনি ভারতবর্ষের মানুষের উপর একটা ভাবাবেগের আবেদন রাখতে সক্ষম ছিলেন তার জোরে তিনি স্বচ্ছন্দে দমনমূলক পদ্ধতির সাহায্যেই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, আচার ও আচরণ প্রসারে সচেষ্ট হতে পারতেন, যেমনটি করেছিলেন কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ইসলামিক রাষ্ট্র ও সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণে। কিন্তু মূলত একজন উদারনীতিক গণতন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন। পরিবর্তে তিনি অর্থনৈতিক বিকাশের উপর আস্থা রেখে এই আশা করেছিলেন যে, দেশের মানুষের কাছে যখন অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তখন ধর্মীয় বিভেদগুলি আপনা থেকেই দূরে সরে যাবে এবং অভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হবে।

অবশ্য অর্থনৈতিক বিকাশের ধীর গতির জন্য এবং যেটুকুও বা উন্নতি হয়েছিল তা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে বিনষ্ট হওয়ার জন্য জনসাধারণের এক বড় অংশকেই আর্থিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক রক্ষণশীলতা ঐ অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। এর ফলে জনসাধারণের যে বিরাট অংশ অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সেকেলে ভাবনায় আচ্ছন্ন তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। বৃহদায়তন নগরায়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তার সত্ত্বেও শহরের অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্য ধর্মীয়, সাবেকী, বিশ্ববীক্ষা স্থায়ী আসন নিয়ে আছে। অপরদিকে বেশ কিছু শহর ও নগর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলগ্রস্ত হয়ে এখন এগুলি ধর্মীয় মৌলবাদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে এমন কিছু আচার ও উৎসবের জন্য অর্থব্যয় হয় যার সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তার কোন সম্পর্ক নেই।

কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা না করে নিতান্ত অভ্যাসবশতই মানুষ এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

সুতরাং নেহেরুর আশা ও বিশ্বাস যে, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং আধুনিকীকরণ আন্তঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দূর করবে এবং জন্ম দেবে এক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির। সেই আশা ফলবতী হয়নি। বোধকরি, দ্রুত বিকাশের পূর্ব শর্তটি পূরণ হয়নি কিংবা বলা যায় আমাদের সমাজ এখনও শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

আবার এটাও হতে পারে যে, আমাদের মত বহুধর্মের সমাজে সাধারণ মানুষ হয়ত তদের নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভেবেই আরও বেশী করে নিজের নিজের ধর্ম আঁকড়ে থাকবে। আবার এটাও বলা যায় যে, ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর থেকে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও নেতা তাঁর মত উৎসাহ এবং অঙ্গীকার নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে উদ্যোগী হননি। অথবা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত এমন কিছু কি আছে, কিংবা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক নীতিটি কেবল পশ্চিমী জগৎ থেকে আমদানি করা নীতি হিসেবেই গণ্য হবে এবং কখনই প্রকৃত অর্থে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হবে না ? বলা বাহুল্য, এই সব বিষয়ে খুব নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান কঠিন। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটির বাস্তব রূপায়ণের পথে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি এখন পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

২২.৬ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাবলী

পূর্ববর্ত্তী অংশে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতা হ'ল কেবলমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত একটি বিষয়। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে তার ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ রাখবে এটা কেউ আশা করে না। তার ফল হ'ল এই যে, স্বাধীনতার সময় যা ভাবা গিয়েছিল তার বিপরীতেই যেন অধিকাংশ ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবনা খুবই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

তাই দেখা যায় যে, ধর্মগুরু এবং ভেল্কিবাজী যাঁরা দেখান তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা অনেক; ঠিকুজী-কুষ্ঠীতে আস্থা বৃদ্ধি এবং জ্যোতিষীদের রমরমা বাড়ছে; রথযাত্রা এবং অনুরূপ ধর্মীয় শোভাযাত্রায় হচ্ছে অসংখ্য মানুষের ভিড় এবং এখনতো সরকার নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমগুলিও ধর্মীয় বিষয়গুলি যথেষ্ট সময় দিয়ে প্রচার করছে এবং নিছকই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা যখন

কেবলমাত্র রাষ্ট্রের তরফে বিভিন্ন ধর্মের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে তখনই এই ভারতবর্ষে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব কীভাবে ? কিন্তু এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়ার আগে জানা প্রয়োজন কী ধরণের সমস্যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ পথে চলতে বাধা দিচ্ছে। এটা জানলে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

২২.৬.১ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সমস্যা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিতর্কিত প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করলেই বোধ করি সবচেয়ে ভাল হবে। আমাদের সংবিধান নির্মাতাগণ দেশের সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। এটা অনুভব করা হয়েছিল, জাতীয় সত্তা গড়ে তেলার জন্য এবং সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সংহতি সাধন করে একটি অভিন্ন নাগরিকতা প্রতিষ্ঠানর জন্য 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা না হলে এই দেশের নাগরিকেরা সর্বদাই দ্বিধাবিভক্ত থাকবে; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ তার ধর্মের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিধির দ্বারা পরিচালিত হবে। তাই স্বাধীনতার পরে এটা আশা করা হয়েছিল যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার জন্য 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' রচনার বিশেষ পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি হয়নি এবং আজ মনে হচ্ছে সংবিধান রচনাকালে যাও বা সুযোগ ছিল এখন সেটি অনেক বেশী সমস্যাসঙ্কুল। যেমন বলা যায়, ১৯৮৬ সালে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সরকারকে বাধ্য করল স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে তাদের 'ব্যক্তিগত বিধি' অনুযায়ী আইন রচনা করতে, যাতে সেই আইন তাদের ধর্মীয় নির্দেশ মত গ্রহণযোগ্য হয়। আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে, কিংবা মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব নিয়েছিল তাদের মতামতকে, সরকার কোন গুরুত্ব দিল না।

একইভাবে খ্রীষ্টান ও শিখ সংখ্যালঘুরা যেভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নির্মাণ অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্য এই ঘটনাটি মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ যেহেতু উদারনীতিক গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে চলছে সেই কারণে এখানে কোন সরকারই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মতামত না নিয়ে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন আইন রচনা করবে না। এই সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে ধর্মীয় বিধির মত অত্যন্ত আবেগজড়িত আইনকানুনের ক্ষেত্রে। আর এইসব সীমাবদ্ধতা এই সত্যকেই নির্দেশ করে যে, ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার পথটি অসংখ্য প্রতিবন্ধকতায় পরিকীর্ণ।

২২.৬.২ রাজনীতি ও ধর্ম

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় এক ধরণের উভয়সঙ্কট দেখতে পাব। দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতার পর এবং তার সঙ্গে যুক্ত নানা ঘটনার ভিত্তিতে এটা আশা করা গিয়েছিল যে, এবার ভারতবর্ষের রাজনীতি স্পষ্টতই ধর্মকে বাদ দিয়ে পরিচালিত হবে। এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, কেননা আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতপাত নির্ভর এবং আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বেশীমাত্রায় স্থায়ী পাচ্ছে। আরও খারাপ ঘটনা হ'ল, রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের জন্য ধর্মীয় এবং জাতপাতের বিভেদগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে,

এমন তথ্য প্রমাণও রয়েছে যা দিয়ে দেখান যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব কৌশল খুবই দুঃখজনকভাবে নির্বাচনী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (যেগুলি মূলত পৌর এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়) অ-ধর্মীয় এবং অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

উপরন্তু, আমাদের রাজনীতির বল্গাহীন সাম্প্রদায়িকীকরণের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক জটিল ও বিষাক্ত আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে যতই ধর্মীয়-রাজনীতির চাপের কাছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নতি স্বীকার করবে ততই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের কথা দূরে থাক্।

ভারতের সীমিত ধর্মনিরপেক্ষতাও যেভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে তার দায়িত্ব বর্তাবে নেহেরু-উত্তর নেতৃবৃন্দের উপর। এই নেতৃবৃন্দের অনেকেই চিন্তার দিক থেকে মুক্তমনা নন; এঁরা এখনও তাঁদের সনাতনী ভাবনায় পরিচালিত-প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য বুঝতে এঁরা অক্ষম। এই নয়া সাবেকী মনোভাবের জন্য তাঁরা ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেভাবে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারেন নি; কেবল ধর্ম থেকে মুক্ত মনোভাব গঠনে নয়, সাধারণ যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঠনেও এঁরা অপারগ। নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ক্রমে ধর্ম থেকে পৃথক করার কাজটি ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

২২.৬.৩ সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়াটি আরও একটি বিপদের সম্মুখীন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্ম এখানে প্রায় একটি 'জাতীয়' ধর্মের মত, বিশেষত , যখন এই দেশের ভৌগোলকি সীমারেখার মধ্যেই এই ধর্মটি সীমাবদ্ধ রয়েছে (অবশ্য নেপাল একমাত্র ব্যতিক্রম)। ফলত, সবার ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ হিন্দুর কাছেই হিন্দুধর্ম জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন। স্মিথ এই ধারণাটি সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, 'রাষ্ট্র যখন জাতীয় আদর্শ গড়ে তুলতে সচেষ্ট তখন তা কার্যত ধর্মকেই উৎসাহদান করেছে'।

ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের এই যোগাযোগকে, যা হিন্দুদের কাছে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে হতে পারে, ঠিকমত বুঝে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে যে, এই দেশে সংখ্যাগুরু—সংখ্যালঘু সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির অনেকটাই এই ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই জন্ম নিয়েছে। তাই দেখা যায় ভূমি-পূজা, নারকেল ভাঙা (কোনও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বা কোনও পুণ্য কাজে) আরতি বন্দনা, অতিথি-অভ্যাগতদের কপালে তিলক এঁকে দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ভাবের প্রকাশকেই দেখেন। কিন্তু অহিন্দুদের কাছে এগুলি হ'ল নিতান্তই হিন্দু-সংস্কৃতির ব্যাপার। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, যে রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সমভাবাপন্ন আচরণে বিশ্বাসী তাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে 'ভারতীয়' মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে যুক্ত থাকতে হবে, যাতে 'ভারতীয়তার' নামে কেবলই হিন্দু মূল্যবোধের প্রসার ঘটান না হয়। অবশ্য যেহেতু দেশের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হিন্দু তাই এটা বলা যায় যে, হিন্দুত্বের বেশ কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক প্রতীককে একইসঙ্গে 'ভারতীয়' বলে গণ্য করা যাবে। কিন্তু তাই বলে সংখ্যালঘুদের প্রতীকগুলিকেও বা তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যাবে না, যখন রাষ্ট্র যাবতীয় ধর্ম থেকে সমদূরত্বে অবস্থানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' এই দুই ধারণাকে নিয়ে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ হ'ল গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংস্কৃতিক মাত্রাটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকা। সব ধর্মীয় উপ-সংস্কৃতিকে একত্রিত করে একটি সংহত সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলার কোন চেষ্টা আমরা করিনি; ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকের উপর ভিত্তি করেও নতুন কোন সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি। অবশ্যই এই ধরণের কাজ খুব সহজ নয়; তবে কিনা এ বিষয়ে কোন উদ্যোগও দেখা যায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাটি খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হ'ল হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলিকে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা। বলা যেতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু মৌলবাদের উত্থানের সঙ্গে জড়িত এ এক 'হিন্দু প্রতিক্রিয়া'। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যা দিয়ে বা কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে ত্রুটি হয়েছে তা উপেক্ষা করা যায় না। কেননা, সংখ্যালঘুদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি ঔদাসীন্য ও অনাগ্রহ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে দেয়।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে সীমিত থাকার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই সীমাবদ্ধ ধারণাটি ভারতীয় নাগরিকদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় সত্তাকে এবং অন্যান্য উপ-সংস্কৃতিমূলক পার্থক্যগুলিকে আরও জোরদার করেছে। যে সব সমাজে এই ধরণের পার্থক্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বের অন্যতম একটি পরিণাম হ'ল এই যে, আমাদের জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের মধ্যে অভিন্ন নাগরিকত্ব, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সুযোগের সমতা ইত্যাদি ধারণাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ফলত, চাকুরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করার সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি ঠিকমত বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। ইমতিয়াজ আহ্মদের কথায়, 'সাম্প্রদায়িক বোধগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বেড়ে চলেছে এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববীক্ষার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে...' তাই বলা যায়, চাকুরীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

২২.৬.৪ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের মনোভাব

যদি মেনেও নেওয় হয় যে, সাম্প্রদায়িক সংস্কার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কোন ক্ষেত্রেই তেমন দূষিত করে তুলছে না, তাহলেও দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘুর মানসিকভাবে এতই নিরাপত্তাবোধহীন যে তারা নিজেদেরকে পক্ষপাত দুষ্টতার শিকার বলেই মনে করে। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কাছে প্রকৃত বৈষম্যমূলক আচরণ যতটা ক্ষতিকর অনুরূপ আচরণ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ততটাই ক্ষতিকর — এই মানসিকতা তাদের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্যম ও সাফল্যকে প্রভাবিত করে। খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে নেহেরু বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাতে নয়, সংখ্যালঘিষ্টরা কী মনে করছে সেটাই হবে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক পরীক্ষা।

শিক্ষা এবং চাকুরীর ক্ষেত্র ছাড়া আন্তঃগোষ্ঠী হিংসা ও সংঘাতের ক্ষেত্রেও পক্ষপাত ও বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এখন তো যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ দিয়েই এটা দেখান যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোটি ক্ষেত্র বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না; দেখা যায় যাদের দায়িত্ব হ'ল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তারা ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী পথে কাজ করছে এবং তার শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা।

গোষ্ঠী ভাবনা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের উৎসব অবশ্যই নিহিত রয়েছে ব্রিটিশ শাসন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের মধ্যে। তা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার যথার্থ প্রচেষ্টা থাকলে আমাদের দেশের মানুষেরা নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে ভারতীয়ত্বের অভিন্ন বন্ধনে নিজেদেরকে সুসংহত করতে পারত।

উপরের আলোচনায় যে বিষয়টি উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তা হ'ল এই যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে পড়বে, বিশেষত যখন আমাদের জাতীয় এবং পৌর জীবনের সব ক্ষেত্রেই ধর্ম তার প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে। আসলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যও একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববীক্ষার বিস্তার; পশ্চিমের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষকরণের সাধারণ সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে। ইমতিয়াজ আহমদ ঠিকই বলেছেন, ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট হিসেবে ঘোষণা করার যে অনন্য এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার বাস্তব রূপদানের জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ উদ্যম ও প্রচেষ্টার। একইরকম প্রয়োজন ছিল সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী শক্তিগুলিকে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা।

২২.৭ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

এখন আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি তা হ'ল : একটি যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা প্রসারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ? গোপাল বলেছেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের উপরই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার জন্য জনসাধারণের মনোভাব পাল্টান প্রয়োজন। নেহেরু আশা করেছিলেন জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পাবে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখেছি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্তত এই প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অপর বিকল্পটি হ'ল শিক্ষা, যা অনেকের মতে অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনায় (নির্দিষ্ট সমস্যাটির সমাধানে) বেশী কার্যকরী। সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তারে শিক্ষার ভূমিকা কিরকম তার পর্যালোচনা করা যাক্।

২২.৭.১ শিক্ষা

আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারে শিক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার সার্বিক ভূমিকা নিয়ে অতিরঞ্জনের সুযোগ হয়ত আছে, তবুও এটা অনস্বীকার্য যে, যে দেশগুলি জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে তাদের জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্ববীক্ষায় আধুনিকতাকে প্রবিষ্ট করাতে শিক্ষার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করতে হচ্ছে।

অতীতে পাঠশালা, গুরুকুল এবং মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা সাবেকী ধর্মীয় বিদ্যাচর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং উন্নত কারিগরী বিদ্যা অর্জনকে গুরুত্ব দেয়। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যার্থীদের, বিশেষত অল্পবয়স্কদের মনের উপর এটি প্রভাব ফেলে। যেহেতু তরুণ মনে নতুন চিন্তা ও নতুন মূল্যবোধ সহজেই ছাপ ফেলে তাই নীবনদের উপর শিক্ষার প্রভাব পড়ে সর্বাধিক। তাছাড়া এদের অনুসন্ধিৎসাও বেশী এবং যা শেখান হয় সেগুলিকে এরা সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখে এবং সেইভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং আশা করা হয় যে, তারাই

সমাজে পরিবর্তন সাধনের কাজ করবে।

ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা অনেকটাই নির্ভর করছে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর, যারা আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদের আলোকে আলোকিত হচ্ছে।

অবশ্য, এই তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশে কতটা সাফল্য আসবে তা অন্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল, কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে ক্রিয়াশীল থাকে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এর আগে আমরা এই এককটিতে দেখেছি যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যেমন বলা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীটি স্পষ্ট। কিন্তু এই ব্যবস্থা শিক্ষা-পাঠক্রম, সেটি যুক্ত যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে, সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেয় না। পাঠক্রমের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট মূল্যবোধ গড়ে তোলার সঙ্গে যুক্ত, তাই দেখা দরকার কীভাবে তা ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সৌভাগ্যবশত এট দেখার জন্য উপযুক্তমাধ্যম ও ব্যবস্থাদিও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং-এর কথা বলা যেতে পারে , যেখানে বিদ্যালয় স্তরের উপযোগী পাঠ্যবই রচনার কাজ হয় এবং সেই সব বইতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপরন্তু, মাঝে মাঝেই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রচলিত পুস্তকগুলির সমীক্ষা করান হয় যাতে কোথাও কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার অবকাশ না থাকে। এই সংক্রান্ত যে কোন তরফ থেকে আনীত অভিযোগকে গভীরভাবে বিবেচনা করা হয় এবং সত্যিই যদি কোন ত্রুটি হয়ে তাকে তা দ্রুত শোধরানোর চেষ্টা হয়। জ্ঞান ও মূল্যবোধের বিস্তারে এগুলিই হ'ল উপযুক্তব্যবস্থা যা সংস্কারমুক্তএবং কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধাচরণকে প্রশ্রয় দেয় না। এছাড়া ঘন ঘন আলোচনাসভা ও সম্মেলনের আয়োজন করে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেই সব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা হয়ে থাকে যা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গঠনমূলক ও সদর্থক দিকগুলিকে প্রকাশ করে এবং সেই অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকেও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রসারিত কর যায়। এসব পদক্ষেপ এই সত্যটিকেও প্রতিষ্ঠিত করে যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধবর্জিত নয়। মূল্যবোধহীন শিক্ষা নিষ্প্রাণ; বিদ্যার্থীকে কোন পথের সন্ধান দেয় না। যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারে শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে ১৯৮৬ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াসে কিছু সর্বজনীন মূল্যবোধ বিকাশের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া এটাও বলা হয়েছে যে, শিক্ষার মাধ্যমেই অজ্ঞাত, পশ্চাৎমুখীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, হিংস্রতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলিকে দূর করার জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের ফলে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী কী তার প্রতি এই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শিক্ষানীতির এই দলিলটিতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অপর যে মাত্রাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হ'ল 'সাম্যের জন্য শিক্ষা'। তাই এই নতুন নীতিতে বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের সমতা আনার কথা বলা হয়েছে, বিশেষত এতকাল যারা সমতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেব বিশেষ দাবী ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে। এই নতুন গুরুত্ব প্রদান বিশেষভাবে উপকৃত করবে মহিলা, তপশীলীভুক্ত জতি ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে, অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভৃতি দুর্বলতর শ্রেণীগুলোকে। ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের

শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যে কোন ব্যক্তিরই প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয় মায়ের সংস্পর্শে থেকেই এবং ফলত, যা কিছু মূল্যবোধ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় তা তার মার কাছে থেকেই পাওয়া। অশিক্ষিত মায়েরা যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করবে এটা আশা করা যায় না। প্রধানত আলোক প্রাপ্ত মায়েদের সাহায্য নিয়েই আমাদের সমাজের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণ করা যাবে। তাই এটা আশা করা খুব যুক্তিযুক্ত যে, যতই ভারতবর্ষের নারী সম্প্রদায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় ততই অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজে ব্যাপক ও সুগভীর পরিবর্তন দেখা দেবে।

২২.৭.২ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে শিক্ষাব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, বিশেষত যদি সমাজটা পশ্চাৎমুখী, কুসংস্কারসম্পন্ন এবং মৌলবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর জন্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে এবং জনমত তৈরী করতে হবে। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে অংশগ্রহণের জন্য সংখ্যালঘুদের উৎসাহিত করতে হবে। সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় ও সমতার নীতিকে জনসমাজের সব স্তরেই প্রসারিত করতে হবে। এই সব মূল্যবোধের বিস্তারে কোন ধর্মীয় বাধাকে আমল দেওয়া হবে না। এই সব কাজে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ হ'ল নারী আন্দোলন, জনগণের জন্য বিজ্ঞান-চর্চ্চার আন্দোলন ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগত আন্দোলনসমূহ।

আশা করা যায়, এই সব প্রচেষ্টাগুলি ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষকরণের পথে প্রভূত অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে। অর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসে তার যথার্থ অবদানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা তার উপযুক্ত দবি জানাতে পারবে।

অনুশীলনী ৩

১) ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে নেহেরুর ধারণা সম্পর্কে পাঁচটি লাইন লিখুন :

.....

.....

.....

.....

.....

২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যাগুলি কী কী ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩) শিক্ষা কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারে সহায়তা করে ?

.....

.....

.....

.....

২২.৮ সারাংশ

এককটিতে চেষ্টা হয়েছে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপটি আলোচনা করার - তার বিবর্তন, পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে তর পার্থক্য, তার সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলি এবং ভারতবর্ষে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসারে শিক্ষার ভূমিকা নির্দেশ করা।

এটা দেখান হয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধানের রূপকারগণ স্পষ্টভাবেই ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় স্বাধীনতা, সুযোগের সমতা, সব নাগরিকের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমতা ইত্যাদির জন্য সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরেছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, এইগুলি একবারে সুনিশ্চিত হ'লে ভারতীয় সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। এটা ঠিকই যে, এই ব্যবস্থাগুলি এবং প্রতিজ্ঞাগুলি অনেকাংশেই কেবলমাত্র সংবিধানের ছপার অক্ষর হিসাবে না থেকে বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছে। যেমন বলা যায়, ভারতীয়রা তাদের নিজ নিজ পছন্দমত যে কোন ধর্মে বিশ্বাস করা, তাকে অনুসরণ করা ও প্রচার করার অধিকার উপভোগ করে, তারা স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি সব দিক থেকেই অবৈষম্যমূলক। এখন এখানে একটি অ-সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী রয়েছে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটিও এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে মুক্ত। সুতরাং, সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সচল, প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এই অলোচনায় এটাও আবার দেখান হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি। যেমন আমরা অভিন্ন দেওয়ানিবিধি তৈরী করতে পারিনি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ধর্মীয় মৌলবদ, পুনরুজ্জীবনবাদ এসব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং অনেক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতীককেই 'জাতীয় সংস্কৃতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষদের মনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যে সমাজ সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ নয় সেখানে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বজায় রাখা কঠিন। তাই এই ব্যক্তব্যও হাজির করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ রাখলে সেটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার প্রসারে সহায়ক হবে না। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থার সীমিত ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর সমাজ এই দুইয়ের মধ্যে যে অমিল ও ব্যবধান রয়েছে তা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি ও জাতি নির্মাণ প্রক্রিয়ার উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

এই চাপ কমানোর জন্য ভারতবর্ষে যে প্রকৃত যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলা প্রয়োজন সে কথা বলা হয়েছে। এই কাজে শিক্ষা কী ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে এবং এটা দেখান হয়েছে যে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে চলেছে।

২২.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

কর্তৃত্ববাদ : এমন এক ব্যবস্থা যেখানে কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য জানাতে হয়।

দেবদাসী : কোন মন্দিরে দেবতার সেবায় নিযুক্ত নারী, ফলত যার কোন ব্যক্তিগত জীবন নেই, যে সর্বজনের নারী।

পুরোহিততন্ত্র : ধর্মীয় সংগঠন সংক্রান্ত।

মুক্তি : বন্ধন থেকে মুক্তি।

মৌলবাদ : এমন এক মতাদর্শ যা সেই জীবনধারায় ফিরে যেতে চায় যেখানে সব কিছু পরিচালিত হবে হুবহু ধর্মীয় গ্রন্থকে অনুসরণ করে।

অর্ন্তঘাতী : পরস্পর ধ্বংসাত্মক।

পশ্চাৎমুখীনতা : পুরোন সনাতন বিশ্বাসগুলিতে আস্থা জ্ঞাপন।

বহুত্ব : নানাপ্রকার সংস্কৃতি ও জাতি গোষ্ঠীর সহাবস্থান।

ধর্মরাষ্ট্র : এমন রাষ্ট্র যা দৈব-বিধি তথা ধর্মীয় নীতি-নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Smith, D. E. : *India as a Secular State*, Princeton University Press, Princetion, 1963.

Luthera, V.P. : *Concept of Secular State and India*, O. U. P. Delhi, 1960

২২.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১) (ক) ধর্মযাজক

(খ) আধ্যাত্মিক, জাগতিক

২) কঠোরভাবে বিচার করলে এটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, কিন্তু ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সহাবস্থান হতে পারে, কেননা ধর্ম কেবল মানবজীবনের অস্তিত্বের অতীন্দ্রীয় তাৎপর্য্যকেই নির্দেশ করে। উভয়ের মধ্যে বিরোধীতার উৎপত্তি হয় এই কারণে যে, কুসংস্কারমূলক আচার ব্যবহারগুলি (যেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি দূর করতে চায়)

ধর্মের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে যায়। অনুচ্ছেদ ২২.২.২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী ২

১) যেখানে পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতর জন্ম হয়েছে একদিকে চার্চ ব্যবস্থা এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষসহ রাষ্ট্র এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ, সেখানে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেন সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের তরফে জনগণকে নিপীড়নের ঘটনা নেই। ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি ঐতিহ্য রয়েছে, ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ২২.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২) (ক) সেইসব সাংবিধানিক ধারা যেখানে বলা আছে যে, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক বিবেকের স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং যে কোন ধর্ম অনুসরণ ও প্রচার করার অধিকার পাবে। অনুচ্ছেদ ২২.৩.২ দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৯৭৬-এর ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

৩) বহুত্ববাদের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র খুবই জরুরি। গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এই বিশ্বাসকেই জোরদার করে যে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখা উচিত। অনুচ্ছেদ ২২.৩.৩ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী ৩

১) নেহেরু এই অর্থে চেয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটুক। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরুর ধারণা ছিল পশ্চিমী মডেলের কাছাকাছি। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার কাজটা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। অনুচ্ছেদ ২২.৫ দ্রষ্টব্য।

২) ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি কেবল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে এই ধর্মনিরপেক্ষতা কোনভাবে হস্তক্ষেপ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সমস্যা বহুবিধ-অভিন্ন দেওয়ানী বিধির অনুপস্থিতি, রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণ ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ২২.৬ ও অনুচ্ছেদ ২২.৬.১, ২২.৬.২, ২২.৬.৩, ২২.৬.৪ দ্রষ্টব্য।

৩) জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলি কেবল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্ববীক্ষায় আধুনিকতা আমদানীর জন্য আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার্জন এবং উন্নত কারিগরী দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এন.সি.ই.আর.টি-এর মত সংস্থা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধ গঠনের উপর জোর দেয়। অনুচ্ছেদ ২২.৭.১ দ্রষ্টব্য।

পর্যায় ৬ : রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার কার্যাবলী বিষয়ে পঠন-পাঠনই এই অংশের আলোচ্য বিষয়। একক ২৩-এ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এবং এ দেশে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও এ দেশে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিসমূহ ও সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী দু'টি অংশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২৪-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়েছে ও যে সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ যুক্তরাষ্টের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচিত হয়েছে।

একক ২৫-এ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অংশে এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ও জয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা এবং ভারতে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শেষ একক ২৬-এ ভারতীয় সমাজের দুর্বলতর অংশের সমস্যা ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের নীতিগুলি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একক ২৩ ❑ ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য

২৩.১ প্রস্তাবনা

২৩.২ প্রস্তাবনা ও মৌলিক মূল্যবোধ

- ২৩.২.১ প্রস্তাবনার অংশসমূহ
- ২৩.২.২ প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অংশ?

২৩.৩ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

- ২৩.৩.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি
- ২৩.৩.২ নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

২৩.৪ মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

- ২৩.৪.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার
- ২৩.৪.২ কর্তব্যসমূহ

২৩.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান

- ২৩.৫.১ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ
- ২৩.৫.২ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি

২৩.৬ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

- ২৩.৬.১ ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র
- ২৩.৬.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসেবে সংবিধান

২৩.৭ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

- ২৩.৭.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
- ২৩.৭.২ একতার নীতি

২৩.৮ সারাংশ

২৩.৯ উত্তরমালা

২৩.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। ১৯৪৯ সালে গৃহীত এই সংবিধান শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থাপন করেনি, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলিকেও ঘোষণা করেছে। সংবিধানব্যাপী যে মূল কথা বলা হয়েছে এই অংশে তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অংশটি পড়ার পর আপনি –

- সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- যে-সকল বিধি অনুসরণ করে রাষ্ট্র কাজ করে থাকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- সংবিধানে ব্যবহৃত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২৩.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য ১৯৪৬ সালে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি গণপরিষদ সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য, যেমন – জনগণের স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায় অর্জন; অনুন্নত জাতি ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ – সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। ভারতের জনগণই যে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস এই বিষয়টি গণপরিষদে সুনিশ্চিত করা হয়। ডঃ বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সংবিধান অনুলিখনকারী একটি কমিটি ভারতের সংবিধান রচনা করে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সেই সংবিধান কার্যকর হয়।

২৩.২ প্রস্তাবনা ও মৌলিক মূল্যবোধ

প্রস্তাবনা হ'ল সংবিধানের যুক্তি ও বিষয়গুলির প্রাথমিক বিবরণী। সেই অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের কেন্দ্রীয় বিষয় ও মূল দর্শন আলোচনা করেছে। এ ভাবেই প্রস্তাবনাটি সংবিধানের রাজনৈতিক ও দার্শনিক বার্তা বহন করে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে :

"আমরা ভারতের জনগণ, সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করছি ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং এ দেশের সকল নাগরিকই যাতে :

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাস, ধর্মে ও উপাসনার স্বাধীনতা;

মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা লাভ করে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সুদৃঢ়করণের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ বর্ধিত হয়, তার জন্য

এই গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমরা এই সংবিধান গ্রহণ করে, বিধিবদ্ধ করে নিজেদের অর্পণ করছি।"

২৩.২.১ প্রস্তাবনার অংশসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, প্রস্তাবনা শুধুমাত্র মূল সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বা সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধকে বিবৃত করে না, ভারতের সংবিধানের এই সকল নীতি যে ওপর থেকে আরোপিত নয় সে কথাটিও স্পষ্ট হয়। ভারতের জনগণ নিজেদের পরিচালনার জন্য নিজেরাই সংবিধান রচনা করেছে। অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবনাকে মূল ন্যায়সঙ্গত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। সম্পূর্ণ প্রস্তাবনাটিকে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে ভাগ করা যায় :

(ক) ঘোষণামূলক

আমরা ভারতের জনগণ, আমাদের এই গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ, নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রস্তাবনার এই অংশের অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য মূলত ঘোষণামূলক। ভারতের জনগণ ও বহির্বিশ্বের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে সংবিধানকে ভারতের জনগন গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবনার এর পরের অংশটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই অংশটি থেকে ভারতের জনগণ, যারা গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্য্য সম্পাদন করে, তাদের জাতিগত ও অন্যান্য বিভিন্নতাকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট কারণ, জনগণ যদি নিজেদের একে অন্যের থেকে পৃথক বলে মনে করে তাহলে তারা একসঙ্গে একটি ঘোষণামূলক বিবৃতি প্রকাশ করতে পারেনা। সব শেষে সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে জনগণের কাছে যারা শুধু সংবিধানকে নিজেরা গ্রহণ, বিধিবদ্ধ ও অর্পন করেছে। সুতরাং, এখানে দেশের বাইরে বা ভেতর থেকে এই সংবিধানকে চাপিয়ে দেবার বিষয় নেই। জনগণের ইচ্ছা জনগণ নিজেরাই সংবিধানে রূপায়িত করছে।

(খ) উদ্দেশ্যমূলক

প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যমূলক অংশটি নীচে বলা হ'ল :

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করে ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

'সার্বভৌম' বলতে এখানে বোঝায় যে, রাষ্ট্র বাইরের দিক থেকে স্বাধীন ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় যে, দেশে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কর্তৃত্বের অধিকারী এবং এখানে সরকারের প্রধান রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রস্তাবনায় যে শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিছক আভিধানিক অর্থেই কার্যকরী বরং জনপ্রতিনিধিগণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা এগুলির সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। যেমন 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির সঙ্গে প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়। 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটির অর্থ নিয়ে লোকসভায় বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য হ'ল, ''সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। 'সমাজতন্ত্র' আমাদের নিজস্ব ধাঁচের। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়করণ করব কিন্তু শুধু জাতীয়করণ করাই আমাদের সমাজতন্ত্রের ধরন নয়।'

একইভাবে জাতিসমূহের কমনওয়েলথের সদস্য থাকা না থাকার সঙ্গে ভারতের সার্বভৌমত্বে কিছু যায় আসে না। যদিও ব্রিটেনের রানী কমনওয়েলথের প্রতীকি প্রধান। কমনওয়েলথের সদস্যপদ সম্পূর্ণভাবে ঐচ্ছিক – তা ভারতের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে না।

প্রস্তাবনার উপর্যুক্ত বিষয়টি শুধুমাত্র 'উদ্দেশ্যমূলক' নয়, 'বাধ্যতামূলক'ও বটে। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোকে একটি নির্দিষ্টভাবে গঠন করতে ভারতের জনগণ বদ্ধপরিকর, তাই জনগণ অথবা কোনও প্রতিনিধিমূলক সংগঠন কোনও অংশকে অমান্য করতে পারে না। রাষ্ট্রের কাজকর্মের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের এই অংশে যা বলা হয়েছে তাকেই তুলে ধরতে হবে।

(গ) বর্ণনামূলক

প্রস্তাবনার বর্ণনামূলক অংশটি হল :

প্রত্যেকটি নাগরিকের মধ্যে যাতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অনুকূল ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় তার চেষ্টা করা। উপরোক্ত অংশটি শুধু নিছক 'বর্ণনা' নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। সংবিধানের দৃঢ় ভিত্তি ও বিষয়-বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেইজন্য প্রস্তাবনায় শুধুমাত্র ব্যক্তির উপভোগ্য বিভিন্ন স্বাধীনতার কথাই বর্ণনা করা হয়নি তার সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অবিচ্ছেদ্য উদ্দেশ্যের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে,

প্রস্তাবনায় মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্যের ধারণাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যা সংবিধানের পরবর্তী অংশগুলিতে বিবৃত করা হয়েছে।

২৩.২.২ প্রস্তাবনা কি সংবিধানের অংশ ?

এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। এমন কি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টও এই বিষয়ে তার মতামত পরিবর্তন করেছে। ১৯৬০ সালে প্রস্তাবনাকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অংশ হিসেবে গণ্য করেনি কিন্তু ১৩ বছর পরে সুপ্রীম কোর্ট প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, কারণ প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সংক্রান্ত আলোচনা একটি বিষয়কেই স্পষ্ট করে যে, সংবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে কিছু মূল্যবোধ। প্রথমত, প্রস্তাবনা ক্ষমতার উৎস হিসেবে রাজার পরিবর্তে জনগণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবনা অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক – সমাজতান্ত্রিক যা নাগরিকদের কিছু মূল অধিকার ও সাম্য উপভোগ করতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবনা একদিকে নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা, অন্যদিকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এই শেষের বক্তব্যটি, আমরা দেখব, সংবিধানের পরবর্তী অংশে জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে।

২৩.৩ রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি তাকে অগ্রবর্তী করেছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের রাজনৈতিক এবং নৈতিক পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছে। ৩৬ থেকে ৫১ – এই ১৯টি ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং মূল মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপায়িত করতে রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা আলোচনা করেছে। তবে সর্বাগ্রে আমরা নির্দেশমূলক নীতি বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করব।

স্বাভাবিকভাবে এই ধারাগুলিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে এগুলি কিছু নির্দেশমূলক নীতির জন্ম দেবে যেগুলি রাষ্ট্রের কার্যাবলী অথবা পদ্ধতির ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই নীতিগুলি এমন একটি বিষয়ের নির্দেশ দেবে যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও নতুনত্ব দেখাবে না। এই বিভাগের শিরোনাম থেকে যা ফুটে ওঠে এটি কিন্তু তা নয়; এটাই আসলে দাঁড়িয়েছে যে এই ধারাগুলিতে যে নীতি নির্দিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তির সম্পর্কে ও তা একটি বিশেষ নির্দেশ দেবে। এর সত্যতা আমরা সংক্ষেপে হলেও যাচাই করতে পারি যদি আমরা ধারাগুলির বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

২৩.৩.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

৩৮ ও ৩৯ নম্বর ধারা দু'টি অন্যান্য নির্দেশমূলক নীতি সংক্রান্ত ধারাগুলি থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সংবিধানের ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের মঙ্গলার্থে ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই যেন জীবিকার্জনের যথোপযুক্ত সুযোগ থাকে ও শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না ঘটে।

৩৮ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের মঙ্গলসাধনার্থে একটি সঠিক সামাজিক কাঠামো গঠন করবে। এই সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ নং ধারাগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেই সার্বিক কল্যাণের

জন্য প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার্জনের যথোপযুক্ত সুযোগ ও সম্পদের যথোপযুক্ত বন্টন থাকবে। সমান কাজের জন্য সমান বেতন, শৈশব ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করা হ'ল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, ৩৮ নং ধারা যেখানে একটি সাধারণ ও সামগ্রিক লক্ষ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, ৩৯ নং ধারাটি সেখানে ওই লক্ষ্যগুলিকে রাষ্ট্রের বাস্তব কার্যপ্রণালীতে রূপান্তরিত করে যা ওই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু পুনরায় বলা হচ্ছে, সংবিধানের চতুর্থ অংশে উল্লিখিত উপযুক্ত ধারা দু'টি সংবিধান কর্তৃক সরকারের প্রতি সাধারণ 'নির্দেশ' এবং কখনই তা 'আদেশ' নয়। সেই কারণে এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়। নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করা হ'লে কোনও ব্যক্তি আইনের প্রতিকার পেতে পারে না।

২৩.৩.২ নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

সংবিধানের চতুর্থ অংশের অন্যান্য ধারাগুলির নির্দেশ হ'ল – বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও অসুস্থতায় নাগরিকরা যাতে রাষ্ট্রের সাহায্য পায় তার জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে গ্রামপঞ্চায়েত সংগঠিত করতে হবে যেগুলি স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে কাজ করবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, নাগরিকরা যাতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ও অবসর উপভোগ করতে পারে রাষ্ট্রকে তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান বা নিদর্শন সংরক্ষণ করা, গো-হত্যা নিবারণ, সারা দেশে একই দেওয়ানি আইন চালু করা, দুর্বলতর শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বার্থের উন্নতিবিধান, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে প্রত্যেকটি নীতিকে অনুসরণ করে তাহলে এটি হবে একটি কাল্পনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা সমতা ও গণ-তান্ত্রিক গুণসম্পন্ন মর্ত্যের স্বর্গে পরিণত হবে।

সুতরাং, এই ধরণের উপদেশগুলি প্রায় অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই উপদেশ, ইচ্ছা বা আকাঙ্খা – এ সবকিছুই সব সময় আমাদের আয়ত্তের বাইরে অবস্থান করে। নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য হ'ল এই যে, এগুলি রাষ্ট্রে সাফল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। কিন্তু এখানে একটি আশঙ্কাও আছে; যদি রাষ্ট্রের প্রতি এই উপদেশগুলিকে জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রের মিথ্যা অঙ্গীকার বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে গণ অসন্তোষ বাড়তে পারে আর রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিস্ফোরণের অবস্থাও আসতে পারে।

অনুশীলনী ১

১। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

.....

.....

.....

.....

.....

২। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২৩.৪ মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকারসমূহ ও মৌলিক কর্তব্যগুলি যথাক্রমে সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ 'ক' অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরে গৃহীত মূল সংবিধানেই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। অন্যদিকে, অতি সম্প্রতি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে ৫১এ অনুচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করানো হয়।

২৩.৪.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

সংবিধান প্রণেতাগণ যখন সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁরা সম্ভবত সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অধিকার উপেক্ষার ইতিহাসকে বিস্মৃত হননি। তাই তাঁরা ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্রের পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিবর্তে মার্কিন সংবিধানের 'বিল অভ্ রাইট্স্'-এর দ্বারা অধিকমাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবুও মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ। কারণ, সংবিধান প্রণয়নের ফল হিসেবে একদিকে যেমন পার্লামেন্টের আবির্ভাব ঘটেছে যা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যেমন, মৌলিক অধিকার, সংবিধানে সংযুক্ত করতে পারে তেমন অন্যদিকে এই পার্লামেন্ট একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংশোধন করতে পারে।

সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫ নং মোট ২৬টি ধারায় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবৃত করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় –

(ক) সাম্যের অধিকার

(খ) স্বাধীনতার অধিকার

(গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

(ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

(ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

(চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

(ক) সংবিধান অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে কোনও ব্যক্তির আইনের চোখে সমতা অথবা আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না এবং রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, বাসস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। অস্পৃশ্যতার আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক উপাধি প্রদানও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়টি, স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজগণ কর্তৃক নবাব, রাজা, রায়সাহেব ইত্যাদি খেতাব বিতরণের মাধ্যমে পদমর্যাদার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হ'ত সেই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) সংবিধানের ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য নয়, একটি সভ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাটি নাগরিকদের যে-সব অধিকার দান করেছে সেগুলি হ'ল বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমাবেশের অধিকার, সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার, যে-কোনও বৃত্তি, পেশা অবলম্বনের অধিকার বা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অধিকার। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অতএব, দেখা যাচ্ছে, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

(গ) চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কোনও কারখানা, খনি বা অন্য কোনও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না। মানুষ নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো বা বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাই হোক, ব্যাপক দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে সবসময় এই অধিকার কার্যকরী হয় না। বহু মানুষই তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা অধিকার দাবী করতে পারে না।

(ঘ) সকল ব্যক্তিই কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে সমানভাবে ধর্ম স্বীকার, ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। ধর্মীয় সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম বিষয়ক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে।

(ঙ) রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

(চ) এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের নিকট আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র কর্তৃক উপর্যুক্ত কোনও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করলে আদালত যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। এই অধিকারটি ছাড়া অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

যাই হোক, উপর্যুক্ত অধিকারগুলি কিন্তু নিরঙ্কুশ নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনে এই অধিকারগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। অধিকন্তু দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে এই অধিকার স্থগিত হ'তে পারে।

অধিকারের বিপরীতদিকে আছে কর্তব্য। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে কতকগুলি কর্তব্য সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় কিন্তু অধিকাংশ কর্তব্যগুলিই অস্পষ্ট এবং নিছক উপদেশমূলক। সুতরাং, এই কর্তব্যের বিরোধিতা কোনও দন্ডনীয় অপরাধ নয়। সম্ভবত আশা করা হয়েছিল যে, চিন্তা ও কাজের কিছু স্বভাব গড়ে তুলতে

এগুলি উপযোগী হবে। কতকগুলি কর্তব্য হল –

- সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
- দেশের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতি ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।
- সংকীর্ণ গোষ্ঠী-চেতনার উর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত করতে হবে; দেশের মিশ্র সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।
- যে-সব মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলিকে অনুসরণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কাররমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার সাধন করতে হবে।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে।

২৩.৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান

সংবিধান উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সেই সময় ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

২৩.৫.১ গণতন্ত্রের উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সরকার বলতে বোঝায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রতিনিধিরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সরকারকে সমালোচনা করার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকে ও এর জন্য 'বিরোধীদের' সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও মুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম। রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে বোঝায় আইনের শাসন, রাজনৈতিক সাম্য এবং সীমাবদ্ধ সরকার।

২৩.৫.২ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি

ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের কিছু রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে যা জনগণের ব্যক্তিগত বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ করেছে। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, নাগরিকদের সরকারের বিরোধিতা করতে সাহায্য করে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সরকার পরিবর্তন করতে পারে। সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। এই ধরণের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা হ'ল সবচেয়ে শক্তিশালী, শাসনবিভাগ, অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিষয়টির উল্লেখ আছে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বাভাবিক কার্যকাল হ'ল ৫ বছর। তাই প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। সেই কারণে প্রস্তাবনায় ঘোষিত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি যথোপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক।

অনুশীলনী ২

১। মৌলিক অধিকারগুলি কেন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য?

.....

.....

.....

.....

২। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনগুলি মৌলিক অধিকার নয়?

(ক) সাম্যের অধিকার।

(খ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

(গ) জীবিকার্জনের ও স্বাধীনতার অধিকার।

(ঘ) কর্মের অধিকার।

৩। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

.....

.....

.....

.....

২৩.৬ সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

আপনি এই অংশের ২৩.২.১ এর ভাগে পড়েছেন যে, সংবিধান সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়তে চায়। এখানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুশীলন করা যাক।

২৩.৬.১ ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র

যদিও প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই সমাজতন্ত্র কিন্তু মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের-হাতে থাকে। এই ধরনের অর্থনীতির মূলমন্ত্র হ'ল জনগণের চাহিদা পূরণ, ব্যক্তিগত মুনাফালাভ নয়। রাষ্ট্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নাগরিকদের কর্মের অধিকার থাকে। ভারতীয় সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে আর গণ্য করা হয় না, কিন্তু তা সংবিধানের ৩০০ (ক) নং ধারায় সাধারণ আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষত, সাম্যের অধিকার, জীবিকা ও বাণিজ্যের অধিকার এবং অন্যান্য অধিকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে। তাই, এক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হ'ল জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বা মিশ্র অর্থনীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এই ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকতে পারে তবে অর্থনৈতিক অসাম্য একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি ন্যূনতম জীবন ধারা বজায় রাখতে পারে।

২৩.৬.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসেবে সংবিধান

আপনি আগে দেখেছেন (একক ২২-এ) যে পশ্চিমের দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। সংবিধান রাষ্ট্রকে কোনও বিশেষ ধর্মের বিকাশ থেকে নিবৃত্ত করে এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে না। আবার রাষ্ট্র থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। তাই রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবে। রাষ্ট্র সমাজ-সংস্কার অথবা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝায় 'সর্বধর্ম সমভাব'। অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে ঔদাসীন্য নয় বরং সকল ধর্মকে সমমর্যাদা দান।

২৩.৭ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য

ভারতীয় সংবিধান সমাজের বৈচিত্র্যের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে এবং সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী। একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উন্নতিবিধানেও আগ্রহী। ভারতীয় সংবিধান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করে।

২৩.৭.১ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

সংবিধান ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে এর ভাষার বিভিন্নতা ও প্রাদেশিক বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে প্রয়াসী। এই ধরণের ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রাদেশিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়। প্রতিটি রাজ্য নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়, যেমন কৃষি, জনস্বাস্থ্য, সেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘুরা তাদের স্বার্থ ও নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে।

২৩.৭.২ ঐক্যের নীতি

সংবিধান জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেছে। এই সরকারের সুবিস্তৃত আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পদ থাকবে। যদি কখনও দেশে ঐক্য ও সংহতি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায়। এই রকম অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করে। যখন কোনও রাজ্য সরকার সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংবিধানের এই সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত থেকে একটি জিনিষ সুস্পষ্ট হয় যে, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থেকে উৎসারিত বিভেদমূলক শক্তি কখনই রাষ্ট্রের ঐক্যকে ভঙ্গুর করতে পারে না।

অনুশীলনী ৩

১। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝেন?

.....

.....

.....

.....

.....

৩। সংবিধানের যে কোনও দু'টি নীতির কথা উল্লেখ করুন যা ভারতের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

২৩.৮ সারাংশ

ভারতীয় সংবিধানের মূলমন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা প্রতিফলিত হয় :

প্রথমত, প্রস্তাবনার প্রাসঙ্গিকতা হ'ল যে, জনগণ নিজেরা নিজেদেরকে কোনও এক বিশেষ প্রকারে শাসন করতে ইচ্ছুক। তাই, এক্ষেত্রে কোনও বহির্শক্তি সম্পূর্ণরূপে অবান্তর। জনগণ ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবনার মূল ভাবাদর্শগুলি মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে ভাস্বর হ'তে দেখা যায়। সংবিধান রচয়িতাদের দূরদর্শিতা ও আদর্শবাদী চরিত্রটি প্রস্তাবনায় পরিস্ফুট হয়। এমন কিছু অধিকার আছে যেগুলি ছাড়া ভদ্রস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয়, সেগুলিই হ'ল মৌলিক অধিকার। আর, ব্যক্তির উন্নতি সাধনে রাষ্ট্র যে পথে অগ্রসর হবে সেই পথের নির্দেশ দেয় নির্দেশমূলক নীতিগুলি। এই নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, একটু বেশি বিলম্বে হ'লেও রাষ্ট্র ও নাগররিকের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিতে আলোকপাত করতে সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলিও সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের কিছু অধিকার প্রদান করে, অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হবে যদি নাগরিকেরা সেই মর্মে কিছু কর্তব্য পালন না করে। এই কর্তব্যগুলির পেছনে কোনও অনুমোদন না থাকায় এটি স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের বিশ্বাস আছে এবং এই মূল্যবোধগুলিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং নাগরিকের মনে এগুলি ধীরে ধীরে জেগে ওঠে যখনই তারা জীবনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারে যা একই সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

পরিশেষে, সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে সুনিশ্চিত করার অবস্থা সৃষ্টি

করে। যদি ব্যক্তিরা কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা উপভোগ না করে তাহলে এই ধরণের গণতন্ত্র সফল বা সম্পূর্ণ হবে না। এই উদ্দেশ্য কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিকে প্রভাবিত করে। জাতীয় সংহতির বিকাশের স্বার্থে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ও সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মূলমন্ত্র।

২৩.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। সার্বভৌমত্বের অর্থ বিদেশি শক্তির থেকে স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের থেকে উৎসারিত চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি নির্বাচনমূলক পদ।

২। আপনার উত্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে :

নির্দেশমূলক নীতিগুলি ইতিবাচক অধিকার।

এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

যে কোনও সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি সহায়তা কররে।

অনুশীলনী ২

১। যদি কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে আদালতে এর প্রতিকার পাওয়া যায়। আদালত সেই আইন বা কাজকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে।

২। কর্মের অধিকার।

৩। যে ব্যবস্থায় সংসদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসন বিভাগ-এর কাছে দায়বদ্ধ।

অনুশীলনী ৩

১। ২৩.৬.২ দেখুন।

২। ২৩.৬.১ দেখুন।

৩। ২৩.৭.১ দেখুন।

একক ২৪ ❑ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক : যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি

গঠন

২৪.০ উদ্দেশ্য

২৪.১ প্রস্তাবনা

২৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

- ২৪.২.১ সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন অংশ
- ২৪.২.২ ক্ষমতার বন্টন
- ২৪.২.৩ সংবিধানের প্রাধান্য
- ২৪.২.৪ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

২৪.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন

- ২৪.৩.১ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ক্ষমতার হস্তান্তর
- ২৪.৩.২ ১৯৩৫ সালের আইন
- ২৪.৩.৩ গণপরিষদ
- ২৪.৩.৪ রাজ্যের পুনর্গঠন ও নতুন রাজ্য

২৪.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

- ২৪.৪.১ কেন্দ্র ও রাজ্য
- ২৪.৪.২ বিষয়গুলির বিভাজন
- ২৪.৪.৩ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা
- ২৪.৪.৪ কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

২৪.৫ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রাজনীতি

- ২৪.৫.১ দলীয় রাজনীতি ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র
- ২৪.৫.২ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি
- ২৪.৫.৩ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

২৪.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবণতা

২৪.৭ সারাংশ

২৪.৮ উত্তরমালা

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই বিভাগে আমরা দেখব কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সররকারগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারা যাবে।

- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তন।
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি।
- সেইসব বিষয় বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে এবং
- বাস্তবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক।

২৪.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক এককে রাষ্ট্রের বিভাজন করা একটি অতি পুরনো প্রথা। এখানে এককগুলি যা প্রদেশ বা রাজ্য নামে পরিচিত হয় তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছু স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিস্তারিতভাবে, যখন অঙ্গরাজ্যগুলি কিছুমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ উপভোগ করে তখন সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র। আধুনিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ যৌথ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতির স্বার্থে একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। তারা একটি সংবিধান তৈরি করে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষমতা উপভোগ করে, বাকি ক্ষমতাগুলি উপভোগ করে অঙ্গরাজ্যগুলি। এই ধরনের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কীভাবে একটি সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়? এখন আমরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

২৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

আমরা আগে দেখেছি যে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। সেই অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে। যে-সব বড় বড় রাষ্ট্রে ধর্ম, ভাষা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে সেইসব রাষ্ট্রে এই ধরনের বিভাজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে যখন বিভিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগণ তাদের কিছু সীমিত স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

২৪.২.১ সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন অংশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে একটি ও রাজ্যগুলিতে একটি করে সরকার থাকে। এই উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতার উৎস হ'ল সংবিধান। এর ফলে উভয় প্রকার সরকারই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, নিজস্ব এলাকার মধ্যে তারা প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ওপর কর্তৃত্ব করে – কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের নাগরিকদের ওপর এবং রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের নাগরিকদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এইভাবে তারা নিজস্ব এলাকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে ও আইন প্রণয়ন করে। এইভাবে উভয় প্রকার সরকারই সমন্বয়সাধনকারী ও স্বাধীন।

একটি রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনটি অংশগুলির উপর নির্ভরশীল এবং অংশগুলির সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে।

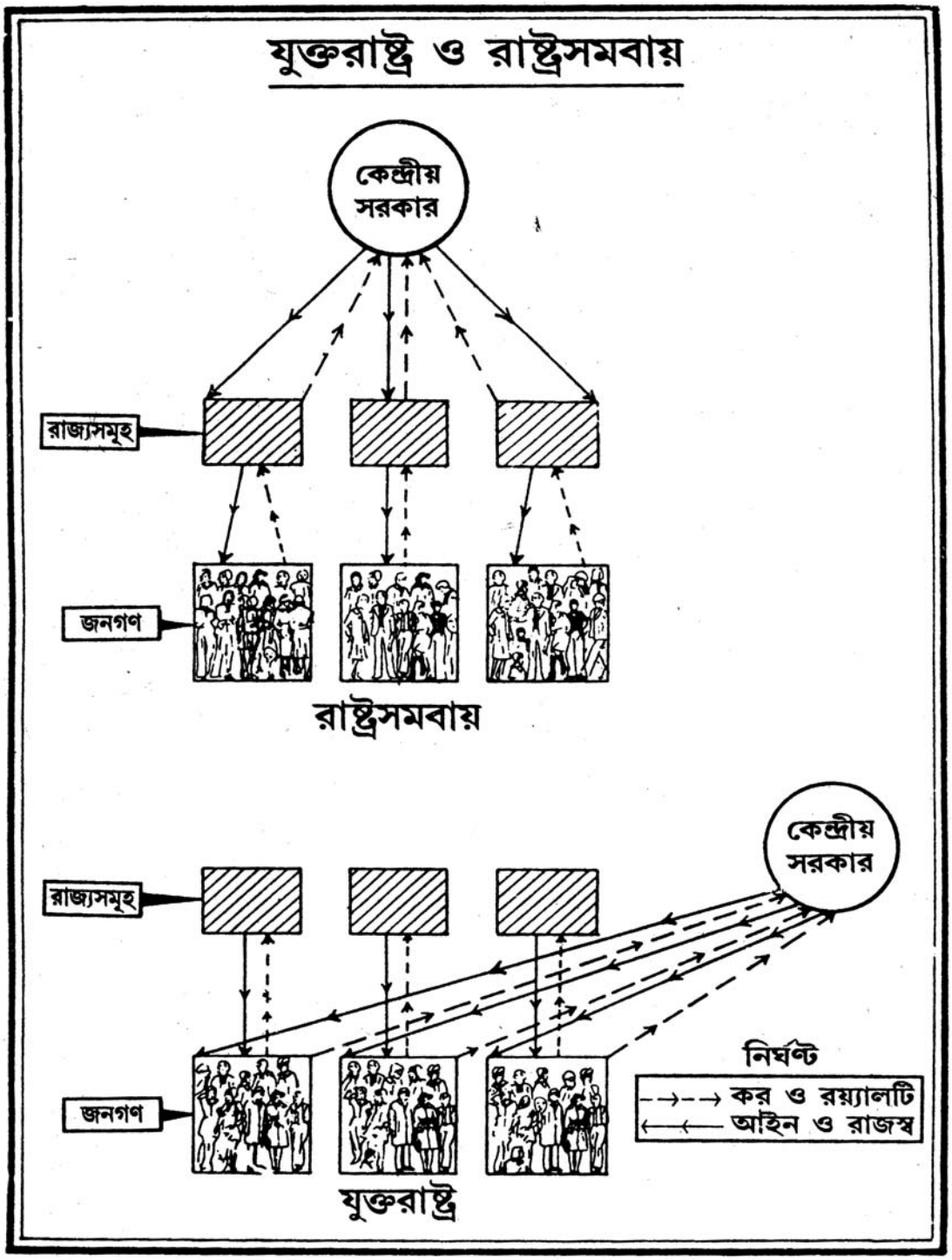
যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়
কেন্দ্রীয় সরকার
রাজ্যসমূহ
জনগণ
রাষ্ট্রসমবায়
কেন্দ্রীয় সরকার
রাজ্যসমূহ
জনগণ
নির্ঘণ্ট
কর ও রয়্যালটি
আইন ও রাজস্ব
যুক্তরাষ্ট্র

অংশগুলি রাষ্ট্রসমবায় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র হ'ল অবিনাশ্য রাজ্যগুলির একটি অবিনাশ্য সম্মেলন। এখানে রাজ্যগুলি সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও সরকারের প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকে না।

২৪.২.২ ক্ষমতার বন্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। সাধারণভাবে, যে-সব বিষয় কোনও জাতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে জড়িত, যেমন – বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি, সেইসব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে, আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যের সরকারকে দেওয়া হয়। সংবিধানই এভাবে ক্ষমতা বিভাজন করে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা এমনভাবে বন্টিত হয় যাতে কোনও সরকার অন্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সংবিধান-নির্দিষ্ট গন্ডিরর মধ্যে থেকে উভয় ধরনের সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করে। ক্ষমতা বন্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও কাউন্টির মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকেও ক্ষমতা প্রদান করা থাকে আবার যে কোনও সময় তা তুলে নেওয়া হয়, কারণ এগুলি কেন্দ্র-প্রদত্ত অধিকার মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি একক রাজ্যকে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়।

২৪.২.৩ সংবিধানের প্রাধান্য

সংবিধান এইভাবে দু-ধরনের সরকারের মধ্যে বিষয়গুলি বিভাজন করে একটি চুক্তির মতো করে যা মেনে চলা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ধরনের সরকারের কাছেই বাধ্যতামূলক। অন্যের সম্মতি ছাড়া এককভাবে কোনও পক্ষই চুক্তির পরিবর্তন করতে পারে না। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া এই সংবিধানকে সংশোধন করা যায় না। সরকারের কোনও কাজ, সে কেন্দ্র বা রাজ্য যাই হোক, যদি এই চুক্তির কোনও শর্তকে, অর্থাৎ সংবিধানকে লঙ্ঘন করে তবে তা বাতিল বা সংবিধান-বিরোধী বলে গণ্য হয়।

২৪.২.৪ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্র ও রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সংগঠন। সে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করবে। বিচারশালা প্রায়শই এই ভূমিকা পালন করে। বিচারালয় সংবিধানকে তুলে ধরে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একজন পক্ষপাতহীন বিচারকের ভূমিকা পালন করে।

২৪.৩ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মূলে আছে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলগুলি ছাড়া বেশ কিছু দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন। তারা বিভিন্ন মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। যেমন, হায়দ্রাবাদের নিজস্ব অর্থব্যবস্থা, রেল ও ডাক ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সর্বোপরি, ভারত সরকার প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ইত্যাদির জন্য দায়বদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ ভারত কয়েকটি প্রদেশ দ্বারা গঠিত ছিল (যেমন বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাংলা, যাদের প্রেসিডেন্সি বলা হ'ত)। প্রত্যেকটি প্রদেশেরই একজন

করে নিজস্ব গভর্নর, আইনসভা ও শাসন পর্ষদ ছিল। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন গভর্নর জেনারেল।

২৪.৩.১ ইংরেজ আমলে ক্ষমতার হস্তান্তর

ইংরেজ রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য খর্ব না করে প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা অর্জনের একটি প্রবণতা ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা অর্পনের পদক্ষেপ ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রাদেশিক সরকার তাদের জনপ্রতিনিধিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের জন্য অধিক ক্ষমতা, বেশি স্বাধিকার দাবি করে। এইভাবে মন্ট-ফোর্ড সংস্কারে ১৯১৯ সালে ভারত-শাসন আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে কিছুটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রাদেশিক আইন পরিষদ কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

২৪.৩.২ ১৯৩৫ সালের আইন

১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম নিষ্ঠা সহকারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইন দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তালিকার স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়। ১৯৩৫-এর আইন ব্যাখ্যার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে অর্পণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে এবং দেশীয় রাজাদের ঔদাসীন্যের ফলে যে রকম ভাবা হয়েছিল সে রকম যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়নি। যাই হোক, ব্রিটিশ ভারতে আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয় ও প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় মুসলিম লিগ প্রদেশগুলির জন্য আরও বেশি ক্ষমতা দাবি করে। অন্যদিকে কংগ্রেস একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে আগ্রহী ছিল। ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লিগের দাবি মেটাতে সচেষ্ট ছিল এবং এই কমিশন অনেকটা রাষ্ট্রসমবায় ধাঁচের একটি সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হয়।

২৪.৩.৩ গণপরিষদ

স্বাধীনতার পর গণপরিষদকে একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান দাবি পূরণ না হওয়ায় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয় তা দমন করার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতবর্ষে যোগদান করার বিষয়ে সর্দার প্যাটেল সফল হন। পন্ডিত নেহরু অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় প্রয়োজন হয় বেশিমাত্রায় কেন্দ্রিকরণ। এইসব বিষয় সংবিধান রচয়িতারা আলোচনা করে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই বিষয়টি নিয়ে ২৩.৫-এ আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এর আগে বিবর্তনের আরেকটা দিকে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে।

২৪.৩.৪ রাজ্য পুনর্গঠন ও নতুন রাজ্য

এই বিভাগের প্রথমদিকে আপনি দেখেছেন যে, স্বাধীনতার সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলি রাজ্য অতি ক্ষুদ্র। সেইসব রাজ্য অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলে গিয়ে একটি অঙ্গরাজ্য তৈরি করেছে এবং কিছু দেশীয় রাজ্য পৃথকভাবে অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্ররাজ্য, যেমন কোলাপুর, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলে গেছে। বৃহৎ রাজ্য, যেমন মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবের কিছু সংখ্যক দেশীয় রাজ্য সম্মিলিত হয়ে গঠন করেছে পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের ইউনিয়ন বা পেপ্‌সু। এই রাজ্যগুলি এক ধরণের অঙ্গরাজ্য তৈরি করে থাকে, যাকে বলা হয় 'খ'

শ্রেণীভুক্ত রাজ্য। প্রাক্তন চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত হয় 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত হয় 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য।

স্বাধীনতার পূর্বে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠনের দাবি ওঠে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই দাবি সমর্থন করে।

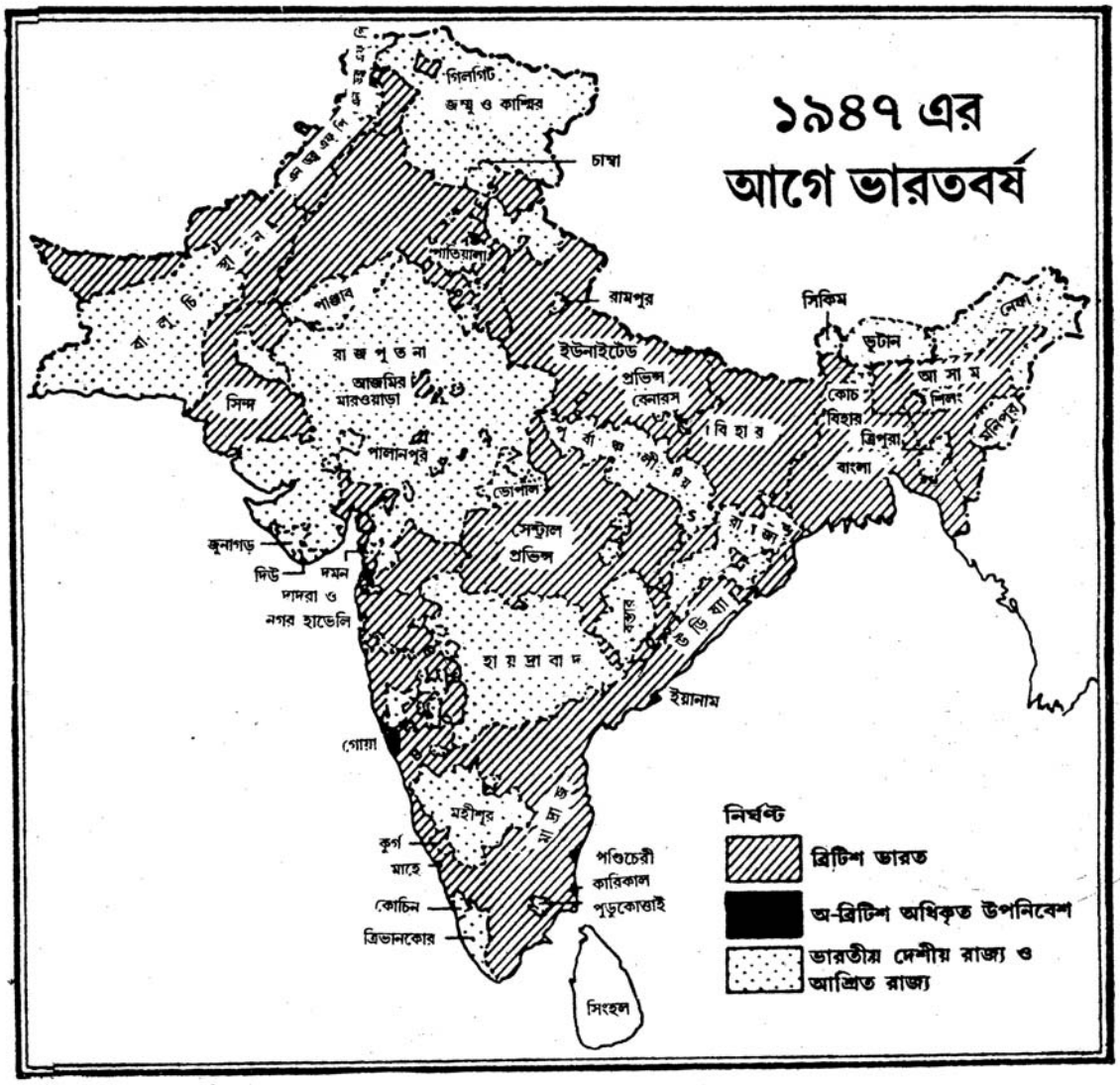

স্বাধীনতার পরে এই দাবি জোরদার হয়ে ওঠে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কায় এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে। ১৯৫৩ সালে পোট্টি শ্রী রামুলুর অনশনে মৃত্যুর ফলে এই দাবি মাদ্রাজ রাজ্যে ব্যাপক হিংসার রূপ ধারণ করে। ভারত সরকার তখন সাধারণের দাবি মেনে নিয়ে তেলুগুভাষীদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠন করে। সরকার একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করে (রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন) এইরকম দাবি বিবেচনার জন্য।

১৯৫৬ সালে এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়। এধরনের পুনর্গঠন চলতে থাকে ও ১৯৬০ সালে দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্যকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে ১৯৬৬ সালে হিন্দীভাষীদের জন্য হরিয়ানা ও পাঞ্জাবিভাষীদের জন্য পাঞ্জাব রাজ্য গঠন করা হয়।

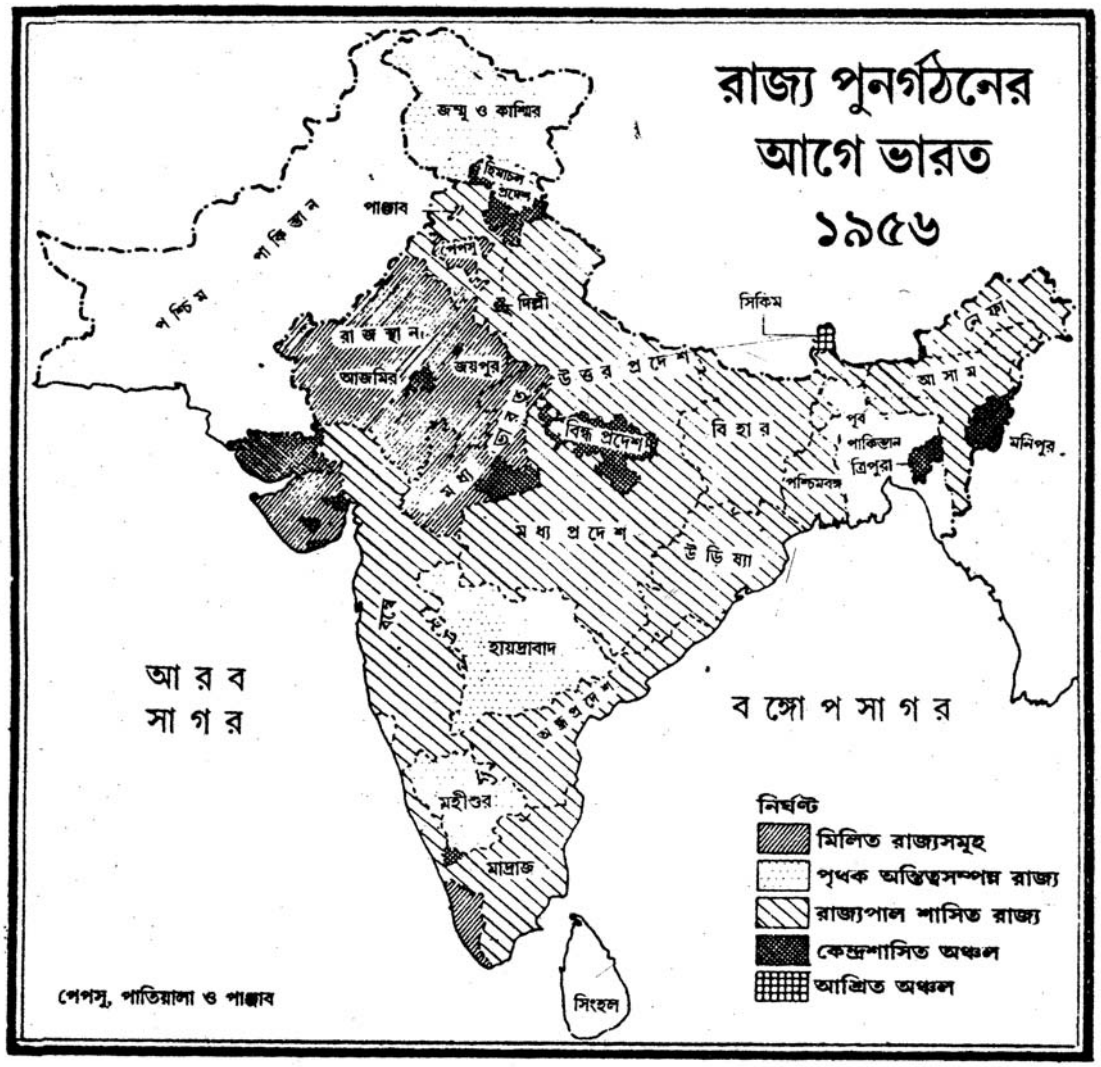

উত্তর-পূর্ব ভারতে অসংখ্য উপজাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সংগ্রামের ফলে ১৯৬২ সালে গঠিত হয় নাগাল্যান্ড, ১৯৮৬ সালে মিজোরাম, ১৯৭১ সালে ত্রিপুরা ও মেঘালয় এবং ১৯৮৬ সালে অরুণাচল প্রদেশ ও ১৯৭৫ সালে সিকিম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭০ সালে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের স্বীকৃতি পায়।

কিছু কিছু ক্ষুদ্র এলাকা আছে যেগুলি ঐতিহাসিক কারণের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে এক হতে পারেনি। এইসব এলাকাকে বলা হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। যেমন চন্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপসমূহ, পন্ডিচেরী, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ। এইসব কেন্দ্রশাসিত এলাকা কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকে।

এভাবে বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ২৮টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

অনুশীলনী ১

১। কোন্ কোন্ বিষয় সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদের সদস্যদের প্রভাবিত করেছিল?

.....

.....

.....

.....

.....

২। কীভাবে সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিষয়গুলি বন্টন করা হয়েছে?

.....

.....

.....

.....

.....

২৪.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের ২৪.২ অংশে উল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্যগুলিই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও কিছু ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছু নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়।

২৪.৪.১ কেন্দ্র ও রাজ্য

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২৮টি রাজ্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি করে সরকার এবং সেই সরকারের একটি আইন বিভাগ, একটি শাসন বিভাগ ও একটি বিচার বিভাগ আছে। কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি জনগণের দ্বারা পৃথকভাবে নির্বাচিত এবং তাদের ক্ষমতার উৎস হ'ল সংবিধান। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে এবং নতুন রাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ওপর সংবিধানের প্রাধান্য বজায় থাকে। সংবিধানের যে অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সেই অংশের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হ'লে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও অধিকাংশ রাজ্য বিধানসভার সম্মতি প্রয়োজন। সংবিধানের বাকি অংশের সংশোধন কেন্দ্রীয় আইনসভা এককভাবে করতে পারে।

২৪.৪.২ বিষয়ের বিভাজন বা বন্টন

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় বন্টন করা হয়েছে। বিষয়গুলি তিনটি তালিকাভুক্ত। কেন্দ্রীয় তালিকায় আছে ৯৭টি বিষয় যা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। রাজ্য তালিকায় আছে ৬৬টি বিষয় সেগুলির ওপর শুধুমাত্র রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়া রয়েছে ৪৭টি বিষয় সংবলিত যুগ্ম তালিকা। যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য প্রণীত আইনের

মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনই বহাল থাকে। এছাড়া যে-সব বিষয় কোনও তালিকাভুক্ত নয় তা কেন্দ্রের অধীনে থাকবে।

২৪.৪.৩ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা

সংবিধানে আমরা এক সংযুক্ত বিচারব্যবস্থা দেখতে পাই, যা কেন্দ্র ও রাজ্য প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সংবিধান যথেষ্ট সচেষ্ট। বিচারালয় সংবিধানের ব্যাখ্যা ও কেন্দ্র-রাজ্যের আইন সাংবিধানিক কিনা তা বিচার করে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে তা মীমাংসা করে।

২৪.৪.৪ কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা

আপনি দেখেছেন ২৪.২ বিভাগে উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে আছে, আবার ২৪.৩.৩ অনুযায়ী ভারতে রয়েছে বিশেষ ধরণের কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা। ভারতের সংবিধানে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র কথাটির উল্লেখ নেই। সংবিধানে ভারতকে বলা হয়েছে রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন। আমরা এখানে তার দু'টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

সংবিধানে সর্বভারতীয় কৃত্যকের উল্লেখ আছে – ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক, ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক, ভারতীয় অরণ্য কৃত্যক ইত্যাদি। এইসব পদের সদস্যদের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission)। আই এ এস (I A S)-এর সদস্যদের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি তাদের বিভিন্ন কাজে বহাল করতে পারে। কারণ এই সমস্ত কাজ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে আর এ কারণেই এটি রাজ্যগুলির স্বাধিকারের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই ধারাটি ভারতীয় প্রশাসনের ও ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের একটি ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; যেমনটি ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় প্রশাসনকে ইস্পাত কাঠামো বলে ধরা হ'ত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, সংবিধানে বর্ণিত জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি। প্রথমত, যুদ্ধ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে এমন গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে যার ফলে ভারত বা তার কোনও অংশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে, তাহলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সমগ্র ভারত বা তার কোনও অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থায় সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে বা রাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে। এর ফলে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবধারাটি ক্ষুন্ন হয়।

কোনওভাবে রাষ্ট্রপতি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনও একটি রাজ্যে শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না, তখন তিনি সংবিধানের ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী সেই রাজ্যের আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিমন্ডলীকে খারিজ করতে পারেন। এই ধরনের ঘোষণা দুই মাসের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে অনুমোদিত হ'লে তা প্রথমে ছয় মাস এবং সংসদ পুনরায় অনুমোদন করলে আরও ছয় মাস বলবৎ থাকবে। এভাবে অনধিক ৩ বৎসর এই জরুরী অবস্থা চালু রাখা যায়। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রায়শই ব্যবহার হ'তে দেখা যায়।